"গীতাঞ্জলি"-সমালোচনা

(প্রতিবাদ)।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার কর, বি, এল্
প্রণীত।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

"গীতাঞ্জলি"-সমালোচনা

(প্রতিবাদ)

শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণং ।
বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং ।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥

—বিবেকচূড়ামণি ।

রয়েছ তুমি একথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে ।

—"গীতাঞ্জলি"

শ্রীউপেন্দ্র কুমার কর, বি, এল,

প্রণীত ।

PRINTED BY KRISHNA MOHAN DHAR, AT THE
CHANDRA-NATH PRESS, MAULVI BAZAR,
SOUTH SYLHET.

ও

যাঁহার

চরণে "গীতাঞ্জলি"

প্রদত্ত হইয়াছে,

তাঁহারি

উদ্দেশে এই অক্ষম আলোচনাও

নিবেদিত হইল।

—লেখক।

কৈফিয়ৎ।

রবীন্দ্রনাথের "নোবেল পুরস্কার" প্রাপ্তি উপলক্ষে আমাদের বাঙ্গালাদেশের লেখক ও পাঠক মহলে যেন একটা চেতনার সাড়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন, বাঙ্গালী কবির এই সম্মানে বাঙ্গালা সাহিত্য এত কাল পরে বিশ্ব-সাহিত্যের বিশাল ভূমিতে স্থান লাভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের অনাদৃত বিস্মৃতপ্রায় সাধনার পরিণয়ের পথ ও মুক্ত হইল। এই হেতু পূর্ব্বকথিত সম্মিলন বিশ্বমানবের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট মহাকল্যাণের শুভমুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবে ভাবিয়া উক্ত মহোদয়গণ এক অনির্ব্বচনীয় আশায় আশান্বিত ও উল্লসিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, আমাদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের তাড়নায় অথবা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাবশে বাঙ্গালী কবির বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর হস্তে এরূপ সমাদর লাভে দারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছেন। তাই উহাদের মধ্যে যাঁহারা এতকাল কবির কাব্যাবলীকে নীরবতা দ্বারা অবজ্ঞা করিতে ছিলেন তাঁহারাও আজ জাগিয়া উঠিয়া কবিবরের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন।

শেষোক্ত নবাভ্যুদিত সমালোচক শ্রেণীর কাহারও কাহারও অসহনীয় ধৃষ্টতায় ধৈর্য্যধারণ করা অসম্ভব হওয়ায় আলস্যজড়তার 'আরাম শয়ন' ত্যাগ করিয়া, নিজের ক্ষুদ্রতার অপরিজ্ঞাত নির্জ্জনতা বর্জ্জন করিয়া এ অক্ষম লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হইয়াছি। ইহাই এ ক্ষুদ্র লেখকের পাঠক-সমাজের নিকট উপস্থিত হইবার কৈফিয়ৎ। বস্তুতঃ কোনরূপ সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জ্জন করিবার দুরাকাঙ্ক্ষাদ্বারা প্রেরিত হইয়া এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হই নাই।

বাদবিতণ্ডার তপ্ত হাওয়ায় যে গ্রন্থের সূচনা, বিরুদ্ধবাদীর মতবাদ খণ্ডন যার মুখ্য উদ্দেশ্য, পরন্তু স্বীয় মত স্থাপন নহে— তাহাতে হয়ত রোষারোষির উত্তাপ থাকিতে পারে, দ্বেষাদ্বেষির অন্ধ ধূলিবৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃষ্ট কাব্যালোচনার সেই

অচঞ্চল গভীরতা ও অতলতার প্রবেশ, সেই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ ও সুনিবিড় রস-সম্ভোগ তাহাতে প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে। তাই প্রথম হইতে পাঠকপাঠিকাগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া তাঁহাদের জন্য অমৃতের ভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছি ভাবিয়া অবশেষে নিরাশ ও বঞ্চিত না হন। তবে, কবির সমুদ্রোপম সুবিশাল কাব্যাবলীর সর্ব্বত্র অমূল্য রত্নরাজি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে—যে-সে ডুবারী যথা-তথায় হাতড়াইয়া কিছু-না-কিছু রত্ন আহরণ করিয়া উঠিবেই। তাই এ আলোচনার কোথাও যদি সুধীবৃন্দ যৎসামান্য সারবত্তার সন্ধান পান, তবে তাহাতে এ ক্ষুদ্র লেখকের কিছু মাত্র কৃতিত্ব নাই বলিয়া জানিবেন।

এ পুস্তিকার কোন কোন অংশ গ্রন্থান্তর হইতে অনাবশ্যক উদ্ধৃত বাক্যবাহুল্যে ভারাক্রান্ত বলিয়া কোন কোন পাঠকের মনে হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের দেশে এমন এক শ্রেণীর কাব্য-বিচারক আছেন যাঁহাদের মধ্যে সরল কথার সহজ অর্থ ত্যাগ করিয়া বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার, সুন্দরকে কুৎসিত করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার একটা প্রবল প্রবণতা লক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর বিচারকদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই প্রবন্ধগুলি লিখিত,—তাই তাঁহাদের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া ভয়ে ভয়ে, পদে পদে অনাবশ্যক নজীর প্রদর্শন করিবার এবং সহজবোধ্য বিষয়কেও বিশদ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভরসা করি অবস্থা বিবেচনায় পাঠক পাঠিকা এই সজ্ঞানকৃত কিন্তু অবর্জ্জনীয় ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

এ গ্রন্থের ১ম ও ২য় প্রবন্ধ 'সবুজ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় গত ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয় নানা কারণে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য ভ্রমশূন্য করিতে পারা গেলনা। অথচ প্রায় ছয়টি মাসের পর আজ মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে পুস্তক খানা উদ্ধার করা গেল। ইতি—

মৌলবীবাজার
১লা আশ্বিন, ১৩২১বাং

বিনীত
লেখক।

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	৬	বেষ্টণ	বেষ্টন
১০	১৫	কারে	করে
১৪	৮	ভাষার	ভাষাব
১৫	১	সূর্ধ্য	সূর্য্য
১৭	১৮	উগ্থাপন	উত্থাপন
১৮	১৯	রুরুণ	করুন
১৯	৭	পুত্র	পূত
২১	৩	উদ্দোশ্য	উদ্দেশ্য
ঐ	১০	হতু	হেতু
২৪	১৫	স্তম্ভি ত	স্তম্ভিত
২৭	১১	স প্রবুক্ত	সুপ্রযুক্ত
২৮	১৫	যোগোপলক্ষে	যোগোপলক্ষে
ঐ	১৭	ভাগবথী	ভাগীরথী
২৯	১	ঘোষঃ	ঘোষঃ
ঐ	১৩	পুণরুক্তি	পুনরুক্তি
ঐ	১৯	বিশ্বাস	বিশ্বাস
৩০	৪	'কবি রবি	'কবি-রবি'
ঐ	১২	সন্ধন	সন্ধান
ঐ	২০	শেয	শেষ
৩৪	১৪	উৎকষ্ট	উৎকৃষ্ট
৩৫	৭	প্রয়শ্চিত্ত	প্রায়শ্চিত্ত
৩৮	২৩	পুণশ্চ	পুনশ্চ
৪১	১৯	রদ্রমূর্ত্তি	রুদ্রমূর্ত্তি
৪৬	১৪	নিম্নোলিখিত	নিম্নোল্লিখিত
৪৭	২১	অন্যত্র	অন্যাংশ
৪৮	১২	পূত	পূত

৫০	৩	তাহার	তাঁহার
ঐ	১৪	কবিতে	করিতে
৫৫	২	নির্ব্বান	নির্ব্বাণ
ঐ	৪	শ্রেয়ষ্কর	শ্রেয়স্কর
৫৭	১৮	ভ্রমন	ভ্রমণ
৫৮	২২	শোতা	শোভা
৬০	৪	ভারে	ভরে'
৬১	২	আরম	আরাম
৬৫	২৬	নৈবেদ্য	নৈবেদ
৭০	৩	উদ্ভুত	উদ্ভূত
৭১	১	একদেশিক	ঐকদেশিক
ঐ	১৪	মহাত্মগণ	মহাত্মা
৭২	১৪	স্থুলদশিগণ	স্থূলদর্শিগণ
৮০	১২	রজ্জা	রজ্জু
৮৬	১১	বধ	বধূ
৮৭	২১	সাঞ্জত	সঞ্জাত
৮৮	১৯	ধ্রব	ধ্রুব
৯৩	৩	সম্মান	সম্মান
৯৪	২৩	মণক্ষুণ্ণ	মনঃক্ষুণ্ণ
৯৮	২৭	সন্বান	সন্ধান

মন্তব্যঃ—এতদ্ব্যতীত কোন কোন স্থলে ি, ী, ু, ূ, রেফ, ্, র, য়, প্রভৃতি অস্পষ্ট হইয়া এবং য ও মূর্দ্ধণ্য ষ তে, ব ও 'র' তে গোলযোগ হইয়া ছাপা হইয়াছে। পাঠক তাহা সহজেই ধরিতে পারিবেন।

"গীতাঞ্জলি"-সমালোচনা—প্রতিবাদ

I

শিলচর হইতে প্রকাশিত "সুরমা" নামক সাপ্তাহিক পত্রে "রবীন্দ্র নাথের গীতাঞ্জলি" শীর্ষক একটি সমালোচন প্রবন্ধ বিগত ১৩ই ও ২০শে মাঘের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কর্ত্তব্য বোধে দু এক কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

এ পর্য্যন্ত "সুরমার" সমালোচক মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত গানটির আলোচনা করিয়াছেন :—

আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া,
ঘুরে মরি পলে পলে।

সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চখের জলে।

সমালোচক মহাশয়ের সমালোচনার মর্ম্ম সংক্ষেপতঃ এই :—

(১) "চরণ ধূলার তলে" মাথা নত করিয়া দিতে হইলে শারীরিক বল প্রয়োগে স্কন্ধদেশ আকর্ষণ করিতে হয়। অতএব এ স্থানে রসভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে—শান্ত রসের উপলখণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া রৌদ্র রসের উৎস প্রবাহিত হইয়াছে।

(২) চোখের জলের অহঙ্কারকে ডুবাইবার শক্তি নাই। প্রমাণ—ভারতীয় ষড়দর্শন ও আধুনিক রসায়ন। অতএব কবির উক্তরূপ আকাঙ্ক্ষা "ভারতীয় কবিত্বের মত প্রলাপমাত্র"।

(৩) "নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান"।

এই বাক্য ব্যাকরণ-দোষে দুষ্ট। অতএব রবিবাবু নিশ্চয়ই "দুষ্টা সরস্বতীর সেবক"।

(৪) "আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে"

এই পংক্তি সমালোচক "গলাধঃ করিতে" পারেন নাই। তাহা করিতে হইলে আপনাকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হয় এবং ইহা করিতে তিনি অসমর্থ। অতএব এ স্থলে কবি "স্বস্কন্ধে আরোহণ করিয়াছেন"।

(৫) সমগ্র গানটি "নির্হেতুক, পূজাহীন প্রার্থনার দৃষ্টান্ত স্থল। অতএব ইহা "প্রভুর প্রতি ভৃত্যের অবৈধ আদেশ" স্বরূপ।

যার যেরূপ শিক্ষা, সংসর্গ ও রুচি তিনি সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পাঠক, তাই আমি কবুল জবাব দিতেছি যে "সুরমার" সমালোচক মহাশয়ের অননুকরণীয় ভাষায়

তাঁহাকে জবাব দিতে অসমর্থ। তবে এ পর্য্যন্ত বলিব যে,যে পাঠকের হৃদয়-দর্পণ কূটতার্কিকতার (Sophistry) আবরণে অস্বচ্ছ বা ব্যক্তিগত কি সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের কালিমায় কলঙ্কিত হয় নাই তাঁহাকে আলোচ্য সরল ধর্ম্ম সঙ্গীতটির সরল সৌন্দর্য্য ও উদার ভাব গ্রহণ করিবার জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হইবে না অথবা দর্শনবিজ্ঞানের দুর্গম অরণ্যে বিচরণ করিয়া পথশ্রান্ত ও পথভ্রান্ত হইতে হইবে না।

ধর্ম্মবৃত্তি যেমন মনুষ্য জাতির জন্মাবধি তাহাদের অন্তরে "সুপ্ত গুপ্ত বা ব্যক্তভাবে" নিহিত আছে ঠিক সেরূপ (বা ততোধিক) পশুভাব বা স্বার্থপ্রবণতা প্রকৃতির দাস মানুষের রক্ত মাংসের সহিত জড়িত আছে। তাই ধার্ম্মিকগণের জীবনেতিহাস পাঠে জানা যায় যে, যে সকল মহাত্মা সাধনমার্গের উচ্চতর সোপানেও আরোহণ করিয়াছেন মায়ার দুর্জ্জয়শক্তির তাড়নায় তাঁহাদিগকেও কখন কখন অস্থির ও নিরাশ হইতে হইয়াছে—নানা আকারে ও প্রকারে মায়া, তার মায়াজাল-বিস্তার করিয়া তাঁহাদের সাধনার বিঘ্ন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই ভক্তসাধক নিজের শক্তির ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারিয়া সহায়তার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হন। তাই আমাদের ভক্ত কবিও প্রায় দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে তাঁর "নৈবেদ্যে" প্রভুর নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

হে রাজেন্দ্র তোমার কাছে নত হতে গেলে,
যে ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে,
লহ ডাকি সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন,
শৈলপথে,—অগ্রসর কর প্রতিদিন
যে মহান্ পথে তব বরপুত্রগণ

গিয়াছেন পদে পদে করিয়া অর্জ্জন
মরণ-অধিক দুঃখ।
তাই—মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ আসি,
অন্তরের আলোক পলকে ফেলে গ্রাসি,
মন্দ পদে যবে শ্রান্তি আসে তিল তিল,
তোমার পূজার বৃন্ত করে সে শিথিল,
ম্রিয়মান—তখনে না যেন করি ভয়,
তখনো অটল আশা যেন জেগে রয়,
তোমা পানে,
তোমা পরে করিয়া নির্ভর,
সে শ্রান্তির রাতে যেন সকল অন্তর
নির্ভয়ে অর্পণ করি পদধূলি তলে।

আর সেই ভাবে ও সুরেই কবি আজ গায়িতেছেন,—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।

অর্থাৎ সকল দম্ভ, সকল ঔদ্ধত্য দয়া করিয়া নিজহাতে দূর করিয়া দিবার জন্য প্রভুর শরণাপন্ন হইতেছেন। কারণ আত্মাভিমানের ন্যায় ভক্তিমার্গের অন্তরায় আর কিছু নাই এবং যখনই ভগবৎ কৃপায় ভক্তির বিমলধারা হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া নয়নে প্রেমের অশ্রু ছুটে, কেবল তখনই আমাদের হৃদয়ের দৃঢ়বদ্ধমূল ঐ অভিমান ভাসিয়া যায়, তৎপূর্ব্বে নহে। তাই কবির আকুল প্রার্থনা,—

সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

এস্থলে সমালোচকমহাশয়ের আপত্তি এই যে "সকল" এই

বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা আলোচ্য কবিতার 'অহঙ্কার' শব্দে সাংখ্যদর্শনোক্ত সপ্ততত্ত্বের অন্তর্গত 'অহঙ্কারতত্ত্বের' যাহা বাচ্য তাহাই স্থচিত হইতেছে। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহৎতত্ত্বের বিকারেই অহঙ্কারতত্ত্ব এবং শেষোক্তের বিকারেই পঞ্চতন্মাত্রাদি এবং একাদশেন্দ্রিয়ের উদ্ভব। অতএব নয়নাশ্রুতে অহঙ্কার ডুবাইতে অর্থাৎ বিলীন করিতে (?) বলা "মত্তপ্রলাপ" মাত্র। যেহেতু অহঙ্কারের পরিণাম দর্শনেন্দ্রিয়বাহিত, জড়ভূত অশ্রুতে অহঙ্কার বিলীন হইতে পারে না।

বঙ্গভাষায় অহঙ্কার শব্দ যে সচরাচর উক্ত দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তাহা সমালোচকমহাশয় যে অবগত আছেন তাহার প্রমাণ তাঁহার নিজের প্রবন্ধেই আছে এবং ঐ শব্দ আলোচ্যস্থলে যে কোন দার্শনিক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই তাহা উপরে যে ব্যাখ্যা আমি দিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে। কিন্তু প্রতাপশালী শার্দ্দূলও যথন নিরীহ মেষশাবকের কোমল মাংসের জন্য লুব্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে যায় তথন তাহাকেও ঐ ব্যাপারের বীভৎসতা ঢাকিবার চেষ্টায় একটা ওজর খুঁজিয়া নিতে হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও ঐ রূপ ওজরের অনুসন্ধানে আমাদের সুযোগ্য সমালোচকমহাশয়কে এতটা বেগ পাইতে হইয়াছে, দর্শনবিজ্ঞানের এত দোহাই দিতে হইয়াছে। আর এক কথা—রবীন্দ্রনাথ যে ধর্ম্মে বিশ্বাসী, তাহা দ্বৈতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে সমুদায় 'আমি'টাকে শুধু অশ্রুতে কেন, পরমাত্মায় বিলয় করিবার জন্য প্রার্থনারও স্থান নাই ইহা বোধ করি সমালোচকমহাশয় স্বীকার করিবেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে সাধারণমানুষের দুটি অংশ--Higher এবং Lower self অর্থাৎ প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং মানুষের পশুভাব।

আধুনিক ভারতের ধর্ম্মবীর, ঋষিতুল্য, রামকৃষ্ণপরমহংসদেব মানুষের শেষোক্ত অংশকে 'ক্ষুদ্র আমি' বলিতেন এবং স্বয়ং বেদান্তানুমোদিত পন্থায় নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইয়াও ভগবানের বিচিত্রলীলার ভাব সম্ভোগ করিবার জন্য ঐ Higher self, "বৃহৎ আমি", 'ভগবানের দাস আমি'টাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতে চাহিতেন। তিনি বলিতেন এইরূপ আমিত্বে, ভগবানের সেবক বলিয়া যে অহঙ্কার তাহাতে কোন দোষ নাই—ইহা ভক্তিসুধা-রস পানের উপায়স্বরূপ। এজন্য আমাদের কবিও গাহিয়াছেন—

সকল গর্ব্ব দূর করি দিব
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না!
সবারে ডাকিয়া কহিব, যে দিন
পাব তব পদ-রেণু-কণা!
যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে
সে দিন সকলি যাবে দূরে,
শুধু তব মান দেহে মনে মোর
বাজিয়া উঠিবে একসুরে।

* * * * *

ঘোষণা করিতে হবে অসংশয়ে—
ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত,
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মত!

মানুষের উপরোক্ত দ্বৈত "গীতাঞ্জলিতে" কবি আরও সুস্পষ্ট করিয়াছেন। যথা:—

'বৃহৎ আমি',

তোমায় আমার প্রভু করে রাখি
আমার আমি সেই টুকু থাক্ বাকি!

তোমায় আমি হেরি সকল দিশি,
সকল দিয়ে তোমার মাঝে মিশি,
তোমারে প্রেম জোগাই দিবানিশি
ইচ্ছা আমার সেই টুকু থাক্ বাকি।
তোমায় আমি কিছুতেই না ঢাকি
কেবল আমার সেই টুকু থাক্ বাকি।
তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভরে,
এ সংসারে রেখেছ তাই ধরে,
রইব বাঁধা তোমার বাহুডোরে
বাঁধন আমার সেই টুকু থাক্ বাকি।

আর—'ক্ষুদ্র আমি,' যথা—

মনকে, আমার কায়াকে,
আমি একেবারে মিলিয়ে দিতে
চাই, এ কালো ছায়াকে।
ঐ আগুনে জ্বলিয়ে দিতে,
ঐ সাগরে তলিয়ে দিতে,
ঐ চরণে গলিয়ে দিতে,
দলিয়ে দিতে মায়াকে,—
মনকে, আমার কায়াকে।
তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে,
পূর্ণ একা দেবে দেখা
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে,—
মনকে, আমার কায়াকে॥

আলোচ্যকবিতায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ ছত্রের 'নিজ' শব্দ যে উপরোক্ত

Higher এবং Lower self এই দুই বিভিন্ন অর্থজ্ঞাপক তাহা পাঠককে বলা বাহুল্য।

"নৈবেদ্যের" কবির আকাঙ্ক্ষা ছিল—

আমারে সৃজন করি যে মহাসম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস শর্ব্বরী,
তার ঊর্দ্ধ শিখা যেন সর্ব্বউচ্চে রাখি,
অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি!
আমার মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্ব মম তোমারি মহিমা।
মহেশ্বর! সেথায় যে পদক্ষেপ করে,
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,
হোক না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তারে যেন দণ্ড দেই দেবদ্রোহী বলে
সর্ব্ব শক্তি লয়ে মোর! যাক্ আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব!

আবার— ওগো অন্তর্য্যামী,
অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্ব্বাণ আমি,
দুঃখে তার লব আর দিব পরিচয়!
তারে যেন ম্লান নাহি করে কোন ভয়।
তারে যেন কোন লোভ না করে চঞ্চল!
সে যেন জ্ঞানের পথে রহে সমুজ্জ্বল,
জীবনের কর্ম্মে যেন করে জ্যোতি দান,
মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান্।

তাই আজ এই আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ সফলতা না দেখিয়া কবির দারুণ দুঃখ—

নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান।

স্বার্থবদ্ধ মানুষ শতচেষ্টায়ও ক্ষুদ্রস্বার্থের গোলক ধাঁধার অনন্ত বেষ্টণ সহজে অতিক্রম করিতে পারেনা, বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। তাই কবির প্রার্থনা ছিল—

শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীন বৎসল,
আশা মোর অল্প নহে! তব জল স্থল,
তব জীবলোক মাঝে যেথা আমি যাই
সেথায় দাঁড়াই আমি, সর্ব্বত্রই চাই
আমার আপন স্থান।

* * * *

আপনারে নিশি দিন আপনি বহিয়া
প্রতিক্ষণে ক্লান্ত আমি! শ্রান্ত সেই হিয়া
তোমার সবার মাঝে করিব স্থাপন,
তোমার সবারে করি আমার আপন!
নিজ ক্ষুদ্র দুঃখ সুখ জল-ঘটসম
চাপিছে দুর্ভর ভার মস্তকেতে মম,
ভাঙ্গি তাহা ডুব দিব বিশ্ব-সিন্ধু-নীরে,
সহজে বিপুল জল বহি যাবে শিরে।

ঐ আকাঙ্ক্ষাই আজ "গীতাঞ্জলিতে" কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে দেখুন—

প্রবল প্রেমে সবার মাঝে

ফিরব খেয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে?
নিখিল আশাআকাঙ্ক্ষাময়
দুঃখ সুখে,
ঝাঁপ দিয়ে তার তরঙ্গঘাত
ধরব বুকে।
মন্দ ভালোর আঘাত বেগে
তোমার বুকে উঠ্‌বে জেগে,
শুনব বাণী বিশ্ব জনের
কলরবে।
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে?

কারণ, ভূমাতেই প্রকৃত আনন্দ ও অমৃত, "নাল্পে সুখমস্তি"।

আর,—তুমি থাক যেথায় সবাই
সহজে খুঁজিয়া পায় নিজ নিজ ঠাঁই।

কিন্তু কার্যাতঃ ক্ষণে ক্ষণে "অহঙ্কার ঘৃণাভরে ক্ষুদ্র জনে রুদ্ধ করে দ্বার", আর "ঈর্ষ্যা চিত্তকোণে বসি রাশি রাশি ছিদ্রকরে তোমারি আসনে" দেখিয়া কবি অনাথশরণ ভগবানকে হৃদয় খুলিয়া বলিতেছেন—

আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।

পাঠক, বোধ করি এখন দেখিয়াছেন, আলোচ্য গানটি

ভক্ত-কবির হৃদয়ের কোন্ উৎস হইতে বাহির হইয়াছে—দেখিয়াছেন ইহাতে আত্মপ্রবঞ্চনা কি আত্মগোপনের চেষ্টা মাত্র নাই—ইহা ভগবানের চরণে ভক্তের সম্পূর্ণ সমগ্র আত্মসমর্পণ ও আকুল নিবেদন। পাঠক, বিচার করিবেন কবির এই প্রার্থনা "নির্হেতুক পূজাহীন" প্রার্থনা কি না—প্রভুর প্রতি উদ্ধত "ভৃত্যের অবৈধ আদেশ" কি না। আর ভগবানের পবিত্র নামের সঙ্গে 'গোলাম' বিশেষণ প্রয়োগরূপ অধর্ম্ম্য পাষণ্ডিক (Sacrilegious) ব্যবহারের দারুণ নির্লজ্জতা মার্জ্জনা করিয়া এই মাত্র আমার বক্তব্য যে ভগবান্ চিরদিনই ভক্তের অধীন—চিরদিনই তিনি ভক্তিরশৃঙ্খলে তাঁর প্রিয় ভক্তগণের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ। ইহাতেই করুণাসিন্ধুর অপার মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রকাশ। পাঠক, ইহাও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন উদ্ধৃত কবিতাংশের ৫ম হইতে ৮ম এই চারিটি দ্রুতগতিশীল হ্রস্বপদ ছত্রে কবি কি কৌশলে মানবহৃদয়ের একটী চিরন্তন ভীষণ দ্বন্দ্ব, পূর্ব্বোক্ত Higher self ও Lower self, মানুষের দেবত্ব ও পশুত্বের, আত্মপ্রীতি ও পরার্থে আত্মত্যাগ বৃত্তির মধ্যে যে অনবরত সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা বড় সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করিয়াছেন এবং ঐ কথাগুলি এজন্য সুতীক্ষ্ণ ক্ষিপ্রগতি শায়কের ন্যায় পাঠকের সুপ্তহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাহাকে মর্ম্মান্তিক আঘাতে পরমকর্ত্তব্যের জন্য জাগ্রত করিয়া দেয়। এবং ঐ কবিতাংশের ভাব ও ভাষার সুন্দর সামঞ্জস্য বড়ই উপভোগ্য,—ভাষা ভিতরকার ভাবটিকে সুস্পষ্ট ধ্বনিত করিতেছে। কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি সমালোচক মহাশয়ের তীব্র সৌন্দর্য্যবোধ ও জ্ঞানাঞ্জনে অনুলিপ্ত দৃষ্টিতে ঐ বাক্যগুলির সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে না। ধন্য, "দুষ্টা সরস্বতী"! অমর কবি Milton বলিয়াছিলেন—

"A grateful mind by owing owes not, but is at once indebted and discharged" এই উক্তি ইংরেজকবির দুষ্টা সরস্বতীসেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ; নতু ঋণ স্বীকার দ্বারা ঋণ পরিশোধ হওয়ার কথা কোন অপ্রমত্ত' ব্যক্তি বলিতে পারেন না।

সরল কবিতার অর্থ বিশদ করিবার জন্য এতগুলি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া এতটা মুল্যবান্ স্থান অনাবশ্যক পূরণ করিবার দরুণ এবং পাঠকের এতটা সময় নষ্ট করিয়া ধৈর্য্যচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তবে এত বাক্য ব্যয়েও যে কূটযুক্তির দুর্ভেদ্যবর্ম্মে সুরক্ষিত সমালোচক মহাশয়ের মনে কোন রূপ স্থায়ী পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিয়াছি সেরূপ দুরাশা আমি করিনা। এরূপ আশা করা, আর উড়ুপসাহায্যে দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করা একরূপ মূঢ়তা। তবে বিজ্ঞ পাঠকগণকে এই মাত্র স্মরণ করাইয়া দিব যে সহৃদয়তাই সম্যক্ কাব্যরসোপলব্ধির, বিশেষতঃ ধর্ম্মসঙ্গীতের ভাব গ্রহণের প্রধান সহায়। যে স্থানে উক্ত শক্তির অভাব, সেখানে "Fair is foul and foul is fair."

II

বিগত ২৭শে মাঘের "সুরমায়" প্রকাশিত সমালোচন প্রবন্ধাংশে মুখ্যতঃ আলোচ্য গীত-কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত (শেষ) অংশটি আলোচিত হইয়াছে:—

আমারে না যেন করি প্রচার,
আমার আপন কাজে;

তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

সমালোচনার মর্ম্ম এই :—

(১) দার্শনিক দোষ।

উদ্ধৃত কবিতাংশের ৩য় ছত্র দার্শনিক দোষ দুষ্ট। যাহা অপূর্ণ তাহাই পূর্ণ করিবার কথা বলা যায়। কাজেই কবি পরমেশ্বরের ইচ্ছার পূর্ণতা নাই বলিয়া ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্নশক্তিবিশিষ্টরূপে সাধনা করিয়াছেন। তাই সিদ্ধান্ত হইল "তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে" এই উক্তি শিশুসমাজে আদৃত হইলেও ভারতের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে না।

(২) আলোচ্য কবিতাটি "শুষ্ক প্রার্থনার" একটী উদাহরণ। কারণ, তাহাতে কোন 'স্তুতি' নাই, কোন 'নতি' নাই কি দৈন্য নাই; অথচ সাধক কবি রামপ্রসাদ বা চণ্ডীদাসের কবিতার ন্যায় তাহাতে ভগবানের সহিত কবির কোনরূপ মায়িকসম্বন্ধের অভিব্যক্তি নাই।

(৩) শাব্দদোষ।

'অসমর্থতা, অবাচকতা প্রভৃতি শাব্দ দোষের ছড়াছড়ি করিয়া কবি ভারতায় শব্দশাস্ত্রের পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। ১ম ছত্রে "প্রচার" শব্দের কবির উদ্দিষ্ট অর্থ "লক্ষণার" দ্বারাও লক্ষ্য

করা অসাধ্য ; ২য় ছত্রে 'আমার' কথাটার প্রয়োগে নিরর্থকতা দোষ ঘটিয়াছে। 'তোমারি ইচ্ছা' প্রভৃতির আত্মসমর্পণে এবং

"যাচি হে তোমার চরম শান্তি"
পরাণে তোমার পরম কান্তি"—

প্রভৃতিতে কবির নিজের যে ইচ্ছা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে ভাষার অসমর্থতা, ভাবের বৈষম্য অমার্জ্জনীয়।

অবশেষে কবিতার ১ম ও ২য় ছত্রে (আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে) জড়পিণ্ড মস্তক প্রভুর পদতলে নোয়াইবার প্রার্থনা করিয়া শেষ কয় ছত্রে 'চরম শান্তি' 'পরম কান্তি' প্রভৃতি ভগবত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করায় কবির যে গুরুতর অপরাধ হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিয়া সমালোচক দণ্ড স্বরূপ কবির মস্তকে মার্জ্জিত ভাষায় অশেষ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। পাঠক, আমাদের সমালোচকের ধৈর্য্য, উদারতা, শীলতা ও শ্লীলতার যদি প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখিতে চান তবে আলোচ্য প্রবন্ধাংশের শেষ কয় ছত্র পাঠ করুন।

সমালোচক মহাশয়ের প্রদর্শিত দোষগুলি যে তিন শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছি তন্মধ্যে ১ম শ্রেণীর বা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দোষের এবং ৩য় শ্রেণীর অন্তর্গত তথাকথিত ভাববিরোধের আলোচনা অগ্র আমি বিশেষভাবে করিব এবং অন্যান্য দোষ গুলির বাস্তবতা সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে যতদূর বলা যায় তাহাই বলিব।

যাহাকে উপনিষদের ঋষিগণ—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ; অনেজদেকং মনসো জবীয়ো" *

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি একমাত্র সৎ বস্তু হইয়াও এই

* অণু হইতেও অণুতর, মহান্ হইতেও মহত্তর; তিনি এক, এবং তিনি অচল হইলেও মন অপেক্ষা অধিকতর বেগশালী

অসৎ জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি নির্গুণ অথচ সগুণ, যাঁহার প্রচণ্ড তেজের নিকট সূর্য্য দীপ্তি দিতে পারেনা, চন্দ্র তারকা প্রকাশ পায় না, ক্ষণপ্রভাসমূহ নিষ্প্রভ হইয়া যায়,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" *

আর—

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" *

অথচ—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" *

সেই সর্ব্ববিরুদ্ধতার একমাত্র সমন্বয়স্থল পুরুষোত্তমের প্রকৃত স্বরূপ কি, তিনি কি প্রকারে কার্য্য করেন বা না করেন তাহা লব্ধব্রহ্মজ্ঞান কতিপয় মহাত্মা ভিন্ন কে নির্ণয় করিবে? তাই গীতা বলিতেছেন—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমা-
শ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥
আশ্চর্য্য স্বরূপ দেখে আত্মা কেহ,

---

* মনের সহিত বাক্য সমূহ যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

* ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, এবং ইঁহার ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত অর্থাৎ স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

* (সাধক) সেই ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া কোথা হইতেও ভয় পান না।

আশ্চর্য্য স্বরূপ কহে অন্যজন,
আশ্চর্য্য স্বরূপ শুনে অন্য কেহ,
শুনিয়াও কেহ না জানে কখন।

গীতা ২। ২৯ নবীন সেনের অনুবাদ।

আর উপনিষৎ—

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
"অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥" *

এই আপাতঃ অসম্ভব (Paradoxical) বাক্যে ব্রহ্মের দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাই আমাদের কবি বলিতেছেন—

আমার দিকে ও মুখ ফিরাও
যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে,
যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে,
হাসি মিছে কান্না মিছে
সাম্‌নে এসে এ ভুল ঘুচাও।

(গীতাঞ্জলি ৩৯ পৃঃ)

তাই সৃষ্টির আরম্ভ হইতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিরোধ, দর্শনে দর্শনে অসংখ্য মতদ্বৈধ। তাই যাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্র একমাত্র সদ্বস্তু, সৃষ্টির ধাতা, পাতা ও নিধনস্থান বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, নিরীশ্বর সাংখ্যেরা সৃষ্টিতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্বের আলোচনায় তাহারই অস্তিত্ব অপ্রমাণিত করিবার জন্য শক্তিব্যয় করিয়াছেন।

---

* যিনি মনে করেন—'আমি ব্রহ্ম জানিতে পারি নাই,' তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন; আর যিনি মনে করেন—'আমি তাঁহাকে জানিয়াছি,' তিনি তাঁহাকে জানেন না। তিনি সম্যগ্‌দর্শী বিজ্ঞগণের নিকট অবিজ্ঞাত এবং অসম্যগ্‌দর্শী অবিজ্ঞগণের নিকট বিজ্ঞাত।

পূর্ব্বোক্ত দার্শনিকদের মতে প্রকৃতি ও পুরুষই সৃষ্টির চরম দ্বৈত (duality)। সাংখ্যোক্ত পরিণত প্রকৃতি এই দৃশ্যমান্ জড়জগৎ ও মানুষের জড়দেহ এবং পুরুষ তদভ্যন্তরস্থ চৈতন্য (monad), অথবা মানুষের যে দ্বৈতকে Higher Self ও Lower Self বলা হইয়াছে, সাংখ্যদের 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' বা প্রধান তাহাই। তাঁহাদের মতে এই দুইএর অতীত কোন চরম সত্তা (one absolute) নাই কি থাকিতে পারে না। উহাদের যুক্তি মোটামোটি এইরূপ,—

যদি জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করা যায় তবে তাঁহার (সৃষ্টির) প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহা হইলে তিনি বদ্ধ (limited) হইয়া পড়েন—তিনি আর পরিপূর্ণ আপ্তকাম থাকেন না। আর যদি তিনি পূর্ণ ও আপ্তকাম হন তবে তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন থাকে না। যাঁহার ইচ্ছা পূরণের প্রয়োজন হইল তিনি আর পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ রহিলেন কিরূপে।

পাঠক দেখিবেন এই যুক্তির সঙ্গে আমাদের সমালোচক যে যুক্তির ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া "তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ" এই উক্তির সমীচীনতা বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তার কত প্রাণগত সাদৃশ্য! বাস্তবিক, আমাদের সমালোচক যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আলোচ্য ধর্ম্ম-সঙ্গীতটির সুকুমার অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিতেছেন একটু তলাইয়া দেখিলেই আর বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনের অথবা ততোধিক স্থূলদৃষ্টি জড়বাদের (materialism) ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই তিনি কাব্য বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং এই কারণেই দেখিতে পাই তাঁহার প্রবন্ধ আপাদ মস্তক অধর্ম্মা (Sacrilegious) মন্তব্যাবলীতে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সাংখ্যদর্শনের পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তি পরম্পরা কিরূপ অসার তাহা শাস্ত্রজ্ঞ পাঠককে প্রদর্শন করিবার জন্য কোন শাস্ত্রের নজির দেখাই-বার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি না। "গীতার" মতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ এক মাত্র' অনাদি-মধ্যান্ত পরম পুরুষের দুইটি বিভাব মাত্র—ইহারা ভগবানের 'অপরা' ও 'পরা প্রকৃতি'।

[ভূমিরাপোহনলো··················

··················

সূত্রে মণিগণা ইব।

গীতা, ৭ম অধ্যায়,

৪—৭ম শ্লোক]

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি ও মন,
অহঙ্কার,—এই অষ্টধা প্রকৃতি মম।
ইহারা অপরা ; অন্য প্রকৃতি পরা আমাব
জীবভূত, মহাবাহো! ধারণ করে সংসার।
ইহাতেই সর্ব্বভূত লভে জন্ম বারম্বার,
আমি সর্ব্ব জগতের প্রভব-প্রলয়াধার।
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কিছু, হে ভারত!
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে মণিগণ মত।

—নবীনসেনের অনুবাদ।

এ প্রসঙ্গে পাঠক উপনিষদের উপদেশ স্মরণ করুণ :—

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রে আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমাল্লোঁকানসৃজত।

অগ্রে ইহা এক আত্মাই ছিল ; ব্যাপার বিশিষ্ট অপর কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন আমি কি লোকসমূহ সৃষ্টি করিব? (অনন্তর) তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন। "সোহ-কাময়ত বহুস্যাং" ইত্যাদি উপনিষদের বাক্য ও দ্রষ্টব্য।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কি অভিপ্রায়ে এই বিরাট্ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন,—মানুষকে তাঁহার প্রকৃতির ভীষণ আবর্ত্তে ফেলিয়া, তাহাতে তাহাকে ডুবাইয়া ও পুনঃ তাহা হইতে উঠাইয়া সেই লীলাময় কি নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন, তাহা কে বলিবে? তাঁহার সৃষ্টি ক্রিয়া বা ক্রীড়ার মধ্যে যে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য গুপ্ত রহিয়াছে, তাহা যে নিরর্থক নহে, তাহা চিন্তাশীল মহাত্মগণ অনুমান করিয়া থাকেন। * তাঁহারা মনে করেন যে ভগবানের লীলানন্দ বা বিলাসই এই সৃষ্টিব্যাপারের কারণ—এই বিলাসের জন্যই সেই পরিপূর্ণ সত্তা অপূর্ণতার ভান করিয়া থাকেন,—যেমন স্নেহময়ী মাতা অসামর্থ্যের ভান করিয়া, তাহার অপূর্ণ-চলচ্ছক্তি শিশু সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া বিমল ক্রীড়ানন্দ উপভোগ করেন ও শিশুকে করাইয়া থাকেন। পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন সমালোচকের যে যুক্তি ও মন্তব্যের আলোচনা করিলাম তাহা কেবল "শিশুসমাজে" এবং নাস্তিক সম্প্রদায়ের নিকটই আদৃত হইবার যোগ্য—অন্যত্র নহে।

এখন তথাকথিত ভাববিরোধের বিষয় আলোচ্য। 'গীতায় ভগবান্ বার বার অর্জ্জুনকে কর্ম্মের অনিবার্য্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

---

* সাংখ্যদর্শনের মতে ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য রহিয়াছে—তাহা পুরুষের প্রকৃতি দর্শন বা ভোগ এবং তদ্দ্বারা মোক্ষসাধন।
যথা—পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥

—সাংখ্যকারিকা

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

দেহধারী জীবকে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বাধ্য করিয়া কর্ম্ম করায়। সে কিছুতেই নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। তাই ভগবান্ মুক্তির পন্থাস্বরূপ কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন। এই কর্ম্মযোগ কি ?—না, "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং"।—কৌশলক্রমে কর্ম্মরাশি করিয়াই কর্ম্মফলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে, যেমন যে বস্তুতে শারীরিক রোগ উৎপন্ন হয় সুকৌশল প্রক্রিয়া-দ্বারা শোধিত সেই বস্তু সহায়েই সুচিকিৎসক সেই রোগ হইতে রোগীকে মুক্ত করেন। এই কর্ম্মযোগের তিনটি অঙ্গ, যথা,—

(১) কর্ম্মফলাসক্তি বর্জ্জন, (২) কর্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কারবুদ্ধি ত্যাগ এবং (৩) ঈশ্বরে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ,—তাঁহারই উদ্দেশ্যে তাঁহারই দাস বা যন্ত্রস্বরূপে তাঁহারই জগতের হিতের জন্য তাঁহারই কার্য্যসাধন করিতেছি এই ভাবে কাজ করা। যিনি ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া এই ভাবে সর্ব্বদা কার্য্য করেন—স্বয়ং ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি তাঁহার প্রসাদাৎ সনাতন পরমপদলাভ করেন।

পাঠক, এখন একবার সমস্ত কবিতাটি পাঠ করুন। দেখিবেন ভগবানের উপদিষ্ট কর্ম্ম-যোগসাধনের যোগ্যতা লাভের জন্য ভক্ত-কবির কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কি একান্ত ঐকান্তিকতা কবিতাটির মর্ম্মে মর্ম্মে স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি কবি কি নিঃসঙ্কোচ সারল্যের সহিত ভগবানের নিকট তাঁহার সমুদায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থলটি পর্য্যন্ত অনাবৃত করিয়া দিয়াছেন। অকপট আত্মসমর্পণ ও ব্যাকুলতা ভিন্ন অন্তর্য্যামীর কৃপালাভ কে করিতে পারে ? তাই কবি সর্ব্বদর্শী করুণাসিন্ধুর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন :—

হে প্রভো, আমাকে তোমার করুণা-কণা দান কর,—হে দীনশরণ, কৃপাপরবশ হইয়া আমার হৃদয়ে ভক্তির পুণ্যপ্রস্রবণ প্রবাহিত কর, নেত্রে প্রেমাশ্রুধারা নির্গত কর, যাহাতে আমার জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত কর্ম্মফলের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারাশি ধৌত হইয়া যাইতে পারে—আমার সকল আত্মাভিমান, সকল অহঙ্কারবুদ্ধি নিঃশেষে দূর হইতে পারে এবং আমি পরিণামে তোমার পুত পদধূলির এক সঙ্গে তোমার শ্রীচরণে স্থান পাইতে পারি (১ম—৪র্থ ছত্র)। তোমার কৃপাবিহনে, হে প্রভো, আমি কেবল আত্মাভিমানের পুষ্টিসাধন করিতেছি আর তদ্দ্বারা তোমারি যে প্রতিমা আমার হৃদয়মন্দিরে বিরাজ করিতেছে তাঁহাকে অপমান, অবজ্ঞা করিতেছি (৫ম ও ৬ষ্ঠ ছত্র)। কোথায় আমি আপনা ভুলিয়া তোমার সাধের জগতকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিব, না দুরতিক্রমণীয়া প্রকৃতির তাড়নে, হে প্রভো, আমি ক্ষুদ্রস্বার্থের গোলকধাঁধার ফেরে পড়িয়া কেবল নিজের ক্ষুদ্রতার গণ্ডীর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি—অমৃতের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্মহত্যা করিতেছি। হে পতিতপাবন, ভক্তিগঙ্গাজলে আমার ক্ষুদ্র আমিত্বাভিমানের পঙ্কিলতা ধৌত করিয়া অপমৃত্যুর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর (৭ম—১০ম ছত্র)।

আমি যেন, হে প্রভো, তোমারি মাহাত্ম্য প্রচার করিবার বাহ্য আড়ম্বরের অন্তরালে, ধর্ম্মপ্রচারের ভান করিয়া প্রকৃত পক্ষে নিজকে ধাম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার অমার্জ্জনীয় অধর্ম্ম অর্জ্জন না করি, তোমারি কার্য্য করিবার অবসরে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ না খুঁজিয়া বেড়াই (১১শ ও ১২শ ছত্র)।

হে ইচ্ছাময়, তোমার যে শুভ ইচ্ছা হইতে এই বিরাট্ সৃষ্টির

উদ্ভব হইয়াছে এ ক্ষুদ্র জনকে তাহা পূরণের যন্ত্র স্বরূপ কর, তাহার ক্ষুদ্রজীবনের সমগ্র কর্ম্ম ও চিন্তারাশি তোমার অভিমুখে প্রবাহিত করিয়া তোমার উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী করিয়া লও (১৩শ ও ১৪শ ছত্র)। হে শান্তিদাতা, তুমি ত সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর, তোমার দিব্যজ্যোতিঃ আমার হৃদয়গুহায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক, যে ভ্রান্তির অন্ধকার তোমার পরমকমনীয় রূপ-জ্যোতিঃ আমা হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে তাহা অপসারিত হউক—তোমার আত্মস্বরূপ আমার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া আমাকে শান্তিসাগরে নিমজ্জিত করুক (১৫শ—১৮শ ছত্র)।

ভাষার দৈন্য ও বুদ্ধির অপ্রাথর্য্য হেতু আলোচ্য ভাবময়ী কবিতাটির ভাব-সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্য যে যথাযথ উপরোক্ত ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছি তাহা বিশ্বাস করি না। বিশেষতঃ এই জাতীয় গীতিকবিতার পূর্ণ রসোপলব্ধি সুরতানসহযোগে তাহা গীত হইলেই হইয়া থাকে। তবুও আশা করি সহৃদয় পাঠক ঐ অক্ষমব্যাখ্যা হইতেই বুঝিতে পারিবেন, যে "শুষ্কপ্রার্থনার" কথা, ভাবের অসঙ্গতির কথা, ভাষার অস্পষ্টতা ও অনিপুণতার কথা সমালোচক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রকৃত পক্ষে কবিতাটিতেই বিদ্য-মান অথবা তাহা সমালোচকেরই উর্ব্বরকল্পনা-প্রসূত।

আর 'যাচিছে তোমার চরম শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি', প্রভৃতি শেষ কয়ছত্রে কবি যে মুক্তির জন্য, পরম শান্তিস্থান লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমালোচকের বিদ্রূপকটাক্ষ শুধু যে অবজ্ঞার যোগ্য তাহা নহে, ইহাতে তিনি পাঠকসমাজকে সকল সাধনপদ্ধতি লঙ্ঘন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। মুক্তির জন্য মানবহৃদয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বধর্ম্মের মূল,—ইহাকে যদি 'কাম'সংজ্ঞায় অভিহিত কর তবে 'নিষ্কামধর্ম্ম'

বলিয়া কোন কিছুই থাকে না—ধর্ম্ম একটা শূন্য বাস্তবতাহীন কাল্পনিক পদার্থ হইয়া পড়ে। যে গীতার পরমশিক্ষা "নিষ্কামধর্ম্ম", চরমদীক্ষা—'ত্যাগ' তার শেষকথা,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ *

ভারতীয় শব্দশাস্ত্রের পদ্ধতি ও সাধন-পদ্ধতি লঙ্ঘন করার যে অভিযোগ কবির বিরুদ্ধে সমালোচক মহাশয় আনয়ন করিয়াছেন তাহা কতদূর ভিত্তিমূলক প্রবন্ধান্তরে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

---

* তাঁহার শরণ লও সর্ব্বভাবে, হে ভারত!
তাঁহার প্রসাদে পাবে শান্তি ও স্থান শাশ্বত।
গীতা, ১৮শ অঃ ৬২ শ্লোঃ

‘গীতাঞ্জলি’’-সমালোচনা—প্রতিবাদ

‘III

কাব্যরস-সুরসিক ইংরেজ সমালোচক যে “inevitable word’’ প্রয়োগ-কৌশলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শ্রেষ্ঠ কবিদের একটা অত্যাবশ্যক গুণ। রবিবাবুর কাব্য-সাহিত্য কি পরিমাণে উক্ত গুণে গুণান্বিত তাহা তাঁহার পাঠকগণ অবগত আছেন। শ্রেষ্ঠ কবিদের দিব্য কল্পনা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যা-নুভূতিই তাঁহাদিগকে ঐ শক্তি প্রদান করে, যার দরুণ তাঁহাদিগকে শব্দচয়নের জন্য অভিধান শব্দকোষাদির অলিতে-গলিতে অন্বেষণ করিয়া শ্রান্ত হইতে হয় না, পরন্তু তাঁহাদের ভাব গুলি স্বতই শব্দাকারে পরিণত হইয়া লেখনী-মুখে বাহির হইয়া পড়ে। এজন্যই তুমি আমি শত চেষ্টায়ও এরূপ একেকটি শব্দের স্থান শব্দান্তর দ্বারা পূরণ করিতে পারিনা। তাহা করিতে গেলে সমগ্র কবিতাটির সঙ্গতি নষ্ট হইয়া পড়ে, রসভঙ্গ হয়,—আর ঐ রূপ শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি (suggestiveness) পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে যে ভাবের তরঙ্গ-নৃত্য স্পন্দিত করিয়া তুলে তাহা অকস্মাৎ নিঃস্পন্দ স্তম্ভিত হইয়া কবিতাটিকে বিকলাঙ্গ, ভ্রষ্টশ্রী ও ব্যর্থ করিয়া দেয়।

আলোচ্য কবিতাটিতে পূর্ব্বোল্লিখিত শব্দপ্রয়োগ-নিপুণতার অভাব নাই। আর, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে যে স্থলে কবি শব্দপ্রয়োগের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন ঠিক সেই সেই স্থলেই

"সুরমার" বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয় কবির অক্ষমতারই পরিচয় পাইয়াছেন—ভারতীয় শব্দশাস্ত্রের পদ্ধতি লঙ্ঘনের প্রমাণ পাইয়াছেন। যথা—

"আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে ;
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।

এই কবিতাংশে নিম্নরেখ শব্দ তিনটি 'অবাচকতা', 'নিরর্থকতা' প্রভৃতি শাব্দদোষের দৃষ্টান্ত বলিয়া সমালোচক নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) আলোচ্য স্থলে "প্রচার" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা অনেক পাঠকের পক্ষেই (দু একজন বিশিষ্ট পাঠক ছাড়া) ধরা প্রয়াসসাধ্য নহে। "প্রকৃতিবাদ" অভিধানে ঐ শব্দের অর্থ (ক) 'চলন', (খ) 'প্রসিদ্ধি' ও (গ) 'প্রকাশ' এই তিন প্রকার লিখিত হইয়াছে। সমালোচক মহাশয় 'প্রকাশ' এই অর্থটি গ্রহণ করিতে গিয়া "ভোজন কালে লেপমুড়ি দেওয়ার" দৃষ্টান্তটি দিবার অবসর খুঁজিয়াছেন ; কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার করাব কথাটা ক্ষণকালের জন্য ও তাঁহার মনে জাগে নাই। ধর্ম্ম প্রচার করা অর্থ ধর্ম্মকে (religion) লোকসমাজে প্রচলিত করিয়া তাহাকে প্রসিদ্ধি দেওয়া বুঝায়। এইরূপ স্থলে প্রচার শব্দের মূল ধাতুগত অর্থ ও পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় অর্থ উভয়ই সূচিত হইতেছে। প্রচার শব্দের এই ব্যবহার বঙ্গভাষায় যে নিত্য হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। তবে "ভারতীয় শব্দ শাস্ত্রের" পারদর্শী বলিয়া ঔদ্ধত্য আমার নাই, কাজেই তাহাতে কি ব্যবস্থা আছে বলিতে পারি না। ঐ শব্দটির প্রয়োগ আলোচ্য স্থলে কিরূপ সুষ্ঠু হইয়াছে তাহা গত প্রবন্ধে কবিতাটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আভাসে বলিয়াছি তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে

পারে। ঐ ব্যাখ্যা হইতে পাঠক দেখিবেন আলোচ্য ধর্ম্ম বিষয়ক কবিতাটিতে "প্রচার" শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অংশে কবি ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া কিরূপে অচলা ভক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, নিজের সমস্ত অহঙ্কারবুদ্ধি, কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর করিয়া দিবার জন্য, তাহাকে ভগবানের সৃষ্টিলীলা-ব্যাপারে যন্ত্রস্বরূপ, আজ্ঞাধীন দাসস্বরূপ করিয়া নিবার জন্য আকুল নিবেদন করিয়াছেন। দাসের কর্ত্তব্য কি ? না, আপনা ভুলিয়া প্রভুর মাহাত্ম্য প্রচার করা। জগতের ধর্ম্মবীরগণ তাই করিয়া থাকেন। কিন্তু ধর্ম্মপথের একটা প্রধান অন্তরায় আছে। তথায় (প্রকৃতির অনুচর) আমাদের রিপু স্বকীয় স্বাভাবিক বেশ পরিবর্ত্তন করতঃ ছদ্মবেশে সাধককে প্রবঞ্চিত করিয়া পথভ্রষ্ট করিতে চাহে,—যে সকল সাধক অর্থলালসা, ভোগস্পৃহা প্রভৃতির আকর্ষণ অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহাদের মনেও ধার্ম্মিকতার প্রতিষ্ঠা লাভের প্রলোভন জন্মাইয়া তাঁদের লক্ষ্য পথ হইতে ভগবানকে আড়াল করিয়া দেয়। তাই ধর্ম্মপ্রচারের ছলে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া বঞ্চিত হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রচারক বা ধার্ম্মিক সমাজে বিরল নহে। তাই ঐ ছদ্মবেশী রিপুর অত্যাচারের কথা আমাদের কবি প্রভুকে জানাইতেছেন—

তারা তোমার নামে বাটের মাঝে
মাশুল লয় যে ধরি।
দেখি শেষে ঘাটে এসে
নাইক পারের কড়ি।
তারা তোমার কাজের ভানে
নাশকরে গো ধনে প্রাণে,
সামান্য যা আছে আমার

লয় তা অপহরি।
আজকে আমি চিনেছি সেই
ছদ্মবেশী দলে।
ইত্যাদি ইত্যাদি।
——গীতাঞ্জলি ৯৪ পৃঃ।

এজন্যই কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে।

এখন পাঠক আশাকরি বুঝিতে পারিয়াছেন আলোচ্য কবিতার উদ্ধৃতাংশের প্রথম ছত্রের * 'আমারে' পদের অর্থ কি এবং 'প্রচার' শব্দ কতদূর সুপ্রযুক্ত হইয়াছে, কতটা ভাবের ব্যঞ্জনা করিতেছে। 'ঘোষণা', 'প্রকাশ' কি অন্য কোন শব্দদ্বারা এতটা ভাব কিছুতেই ব্যক্ত হইতে পারিত না। কারণ, "প্রকাশ" বা 'ঘোষণা', বা 'প্রসিদ্ধি' প্রভৃতির সঙ্গে, 'প্রচার' শব্দের ন্যায়, ধর্ম্মতত্ত্ব বিস্তারের (Preaching এর) ভাব (Idea) টা ত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নাই। 'প্রচার' শব্দ মনোবিজ্ঞানবর্ণিত Association of ideas এই নিয়মের বলে যে পূর্ব্বোক্ত ভাবরাশি পাঠকের মনে স্বতই জাগাইয়া দেয় ঐ শব্দটি বর্জ্জন করিয়া ঐ স্থলে শব্দান্তর ব্যবহার করিলে তার কোন সন্ধানই পাওয়া যাইত না এবং তাহা হইলে আলোচ্য স্থলের কবির অভিপ্রেত অর্থটি পাঠকের নিকট অব্যক্ত থাকিয়া কবিতাটিকে পঙ্গু ও সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট করিয়া দিত। সমালোচক মহাশয় লক্ষণার বুলি আওরাইয়াও আলোচ্য স্থলে ঐ শব্দের অর্থটি লক্ষ্য করিতে পারেন

* "সুরমার" সমালোচক এই শব্দের অর্থ লইয়াও বড় সমস্যায় পড়িয়াছেন।

নাই। ইহা কবিরই দুর্ভাগ্য কি পাঠকের দুর্ভাগ্য ঠিক বলিতে পারি না।

লক্ষণা বা শক্যসম্বন্ধ বা Context দ্বারা অর্থনির্ণয় করা সকলের ঠিক একরূপ হয় না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি এক ব্রহ্মসূত্রের ও শ্রুতিরই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নয় ঐ সকল মহাত্মাদের ব্যক্তিগত সংস্কার ও অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা। কাব্যের তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। কবির ভাবকে আমরা যথাযথ ধরিতে পারি যদি আমরা তাঁহার সমগ্র কাব্যের সহিত সুপরিচিত থাকি ও উক্ত পরিচয়জাত সহানুভূতি আমাদের হৃদয়ে জন্মিয়া থাকে। তদন্যথা আমাদের ঐ কবির কাব্যালোচনা পণ্ডশ্রম হয়—যে ভাবকে কবি ভাষা দিয়াছেন তাহার চিত্র উলট্‌পালট হইয়া আমাদের হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষণার মামুলী উদাহরণটা ধরুন। যিনি কোন যোগোপলক্ষে গঙ্গাতীরের বহুজনতার ঠেসাঠেসির মধ্য দিয়া কোন রূপে কেবল প্রাণটি হাতে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে একদিন মাত্র গঙ্গাবক্ষে ডুব দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু ভাগিরথীতীরের কোন জ্ঞান লাভ করিবার অবসর পান নাই তিনি "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্যের ব্যাখ্যা হয় এই করিবেন যে গঙ্গাজলে ঘোষ বাস করে, অতএব 'ঘোষ' কোন রূপ জলচর জন্তু বিশেষ হইবে; নয়, তিনি এই সিদ্ধান্ত করিবেন যে ঐ বাক্যটি অবাচকতা নামক দোষের একটা উদাহরণ মাত্র, লেখকের "মত্তপ্রলাপ মাত্র"! যে ব্যক্তির কথা উপরে অনুমান করিলাম তিনি যদি 'ঘোষ' শব্দের সকল অর্থ সম্যক্ অবগত থাকেন তবে শেষোক্ত সিদ্ধান্তে যে তিনি উপনীত হইবেন তাহা নিশ্চিত বলা যায়। অতএব "গঙ্গায়াং

ঘোষঃ" বলিতে 'গঙ্গা' পদের গঙ্গাতীর ব্যতীত পদার্থান্তরে শক্তি-গ্রহ ঘটেনা" সমালোচকের এই মন্তব্য যে সর্ব্বস্থলে সত্য না ও হইতে পারে তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

(২) অতঃপর আলোচ্য কবিতার উপরে উদ্ধৃত ছত্র চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটির প্রথম শব্দের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন 'আমার' এবং 'তোমার'—ভক্তের ও ভগবানের মধ্যে যে * বিরোধ জীবনের কার্য্যে ও ব্যবহারে সচরাচর লক্ষিত হয় তাহা সুস্পষ্ট করিয়া তাহা দূর করিবার জন্য ভক্ত-কবি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। 'আপন কাজে' এই কথাগুলির পূর্ব্বে 'আমার' কথাটা না থাকিলে উক্ত contrast বা বৈষম্যটা এত প্রস্ফুট হইয়া উঠিত কি—কবির বক্তব্যটি এত জোর (emphasis) পাইত কি ? কোন ভাবে জোর দিবার জন্য একটি কথারই পুণরুক্তি করার প্রথা সকল ভাষা ও সাহিত্যেই বোধহয় আছে, তবে সমালোচকের "ভারতীয় শব্দ শাস্ত্রের পদ্ধতি" যদি ভিন্ন রূপ হয় তবে আমাদের কবি নাচার।

(৩) "তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে" এই বাক্যে 'জীবন' শব্দের অর্থ কি তাহা যাহারা ইতরজাতীয় প্রাণীগণের ন্যায় কেবল আহার-বিহারধর্ম্মী নহেন তাহারা সকলেই বুঝিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। বিশেষতঃ কোন ভারতীয় আর্য্যসন্তানের পক্ষে ঐ শব্দ ও সমগ্র বাক্যটির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে যদি কিছু মাত্র প্রায়াস পাইতে হয় তবে এতদপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয় আর কিছু হইতে পারে কি না আমি কল্পনা করিতে পারি না। কারণ, প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের জ্ঞানোদ্ভাসিত

* তোমার সাথে নিত্য বিরোধ আর সহেনা
দিনে দিনে উঠ্‌ছে জমে কতই দেনা।—গীতাঞ্জলি ১৭১পৃঃ

সাধনার মর্ম্ম বর্ত্তমান পতিত ভারতসন্তানের প্রত্যেকেরই রক্ত-মাংসের সহিত, তাহার অস্থিমজ্জার সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া আছে—তাহাতে 'সুপ্ত গুপ্ত ভাবে' বিদ্যমান রহিয়াছে। একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তাই আমাদের 'কবি-রবি তাঁর দিব্যনেত্রে ইহা দেখিয়া আশ্বাস দিয়াছেন—

"হে বিশ্বপালক!
তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয় ত লুকায়ে আছে পূর্ব্ব সিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্য্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্ব্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল—ব্রহ্মমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায়!

আর, উক্ত সাধনার সন্ধান পাশ্চাত্যেরা এখনও সবিশেষ পান নাই বলিয়া—

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা!
এই শ্মশানের মাঝে শক্তির সাধনা
তব আরাধনা নহে, হে বিশ্বপালক!"

তাই—

——"হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী! দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী

তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি' তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম;—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা সরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

* * * *

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বহি' স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্ব্বতের পানে।

যে ভারতীয় সাধনার কথা উল্লেখ করিলাম তাহা কি? তাহা আজ এ দুর্দ্দিনে

"রুদ্ধ ভয়ে বাজে
রাত্রিদিন জীর্ণ শাস্ত্রে শুষ্কপত্র মাঝে

এই সাধনার পরম শিক্ষা—ত্যাগ। ইহার আদেশ বাণী—"স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।" ইহার দীক্ষা—

"মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়, তাঁরে জেনে, তাঁরপানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি!"

আর ঐ সাধনার লক্ষ্য—পরমা শান্তি;—

যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবন তলে;
বস্তুভারহীন মন সর্ব্ব জলে স্থলে

পরিব্যাপ্ত করি' দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্ব্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে!

ভারতের শিক্ষা—

"দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মত, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য্য যত!"

পাঠক, প্রকৃত ভারতের ও তার সাধনার স্বরূপ কি তাহা সংক্ষেপে আমাদের কবির মুখে শুনুন—

"কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার!
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।" *

প্রাচীন ঋষিদের মতে আমাদের প্রকৃত জীবন কি, মৃত্যু কি এবং কি প্রকারে আমাদের জীবনে সেই "সর্ব্বকর্ম্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা", শান্তশিব অদ্বৈতের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা বোধ

---

* ভারতীয় সাধনার ও সভ্যতার মর্ম্মস্থানের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কত গভীর ও সত্য তাহা যে সকল পাঠক জানিতে চাহেন তাঁহাদিগকে "নৈবদ্য" ও ৮ মোহিত বাবুর সংস্করণ "কাব্যগ্রন্থ" হইতে 'স্বদেশ' শীর্ষক কবিতাগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

করি পাঠক বুঝিতে পারিলেন। আর, আমাদের এই দৃষ্টতঃ ছ'দিনের ক্ষণিক জীবনের ধারা প্রকৃত পক্ষে কোন্ আদিকাল হইতে কত বিচিত্রতার মধ্য দিয়া বাহিত হইয়া কোন্ ভাবে, কোন্ অভিমুখে ছুটিয়াছে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে হইলে, পাঠক "গীতাঞ্জলির" ২২ ও ৬৬ সংখ্যক কবিতা এবং রবিবাবুর প্রথম সংস্করণ কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে 'অনন্তমরণ' 'অনন্তজীবন' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষ ভাবে পাঠ করিবেন। এখন শুধু শুনিয়া রাখুন—

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে?
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়-সভা জুড়িয়ে তারা বসিবে নানা সাজে।

* * * * * * *

রয়েছ তুমি একথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে।

গীতাঞ্জলি, ১৯ পৃঃ।

"শুষ্ক প্রার্থনা" বিষয়ক আপত্তির মূল্য কি তাহা বিশেষ ভাবে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

IV

"গীতাঞ্জলি" কি ভারতের চক্ষুতে 'শুষ্ক প্রার্থনা'? এই প্রশ্নই এখন আলোচ্য।

"সঙ্গীতং কাব্যশাস্ত্রঞ্চ সরস্বত্যাঃ স্তনদ্বয়ম্।
একমাপাতমধুরং অন্যদালোড়নামৃতম্॥

মাতা সরস্বতীর দু'টি স্তন,—একটি আপাতমধুর, অপরটির রস-মাধুর্য্যাস্বাদন আলোড়ন সাপেক্ষ। একটি হইতে স্বতই ক্ষীর-ধারা বিনিঃসৃত হইয়া আপামর সকলকেই ক্ষণকালের জন্য তৃপ্ত করে, কিন্তু আলোড়নপটু সুধীবৃন্দই অপরটির পীযূষ-সুধা পানে স্থায়ী আনন্দ লাভে কৃতার্থ হয়েন। একটির নাম সঙ্গীত, অপরটির নাম কাব্যশাস্ত্র। স্তন্যপায়ী শিশু স্বভাবজ কৌশলে মাতৃস্তনে মুখ প্রয়োগ করিবা মাত্র যেমন মাতৃবক্ষ আলোড়িত হইয়া তাহাকে সুধাদানে পরিতৃপ্ত করে, ঠিক তদ্রূপ কাব্য-রস-সুরসিকই বিনা আয়াসে কাব্য-রস সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন। অপর পক্ষে, রক্তভোজী জলৌকাকে মাতৃবক্ষে প্রয়োগ করিলে যেমন শোণিত প্রবাহ নিঃসৃত হইতে হইতে মাতার অপমৃত্যুর সংশয় উপস্থিত করে, সেই রূপ অরসিকের হস্তে উৎকৃষ্ট কবিতারও প্রাণ হানি ঘটিবার গুরুতর সম্ভাবনা। তাই পাঠককে প্রথমেই সতর্ক করিয়া দিতেছি, আপনি বিদ্বেষসংকীর্ণতার সূচীমুখ বর্জ্জন করিয়া কাব্য-সুধাপানে ব্রতী হউন। শিশুর ন্যায় সরলোদার হৃদয়ে কাব্যালোচনা করিলে দেখিবেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য-লক্ষ্মী আপনার জন্য কত অক্ষয় রসভাণ্ডার নিজ বক্ষে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

ভগবানের নিকট দৈন্য প্রকাশের প্রথা সকল ধর্ম্মেই আছে। কারণ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী অনন্ত পুরুষশ্রেষ্ঠের সমীপবর্ত্তী হইতে গেলেই স্বল্পশক্তি মানুষের মনে স্বতই তার [illegible] ক্ষুদ্রত্ব এবং সূক্ষ্মতম পাপকণাও উজ্জ্বলরেখায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এ জন্যই প্রকৃতপক্ষে যে মানুষ ভগবানকে চায় সে

তাঁহার চরণরেণুর কাছে অবনত হইয়া পড়ে। এ জন্য খৃষ্টীয় ভক্ত যখন প্রকৃত ভাবে ভগবানের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন তখন Confession (আত্মপাপ স্বীকার) দ্বারা হৃদয় নিহিত গুপ্ত পাপের কথাও অকপটে নিজমুখে খ্যাপন করেন। আর, এ জন্যই হিন্দুর জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত পাপের অথবা পাপচিন্তার জ্ঞান যখন তীব্র হইয়া তাহাকে অরুন্তুদ যন্ত্রণা দিতে থাকে তখন তিনি পতিতপাবনের নিকট প্রয়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন। এই Confession ও প্রায়শ্চিত্তই ধর্ম্মপিপাসুগণের প্রকৃত দীনতা। এ জন্যই মুখের কথায়—"হে প্রভো, আমি অতি দীনহীন, সাধন ভজনবিহীন" ইত্যাদি বাক্য বিন্যাস দ্বারা হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশস্থ পাপকালিমাকে ঢাকিয়া রাখিয়া অনেক সময়ই আমরা দৈন্যের ভান করিয়া থাকি এবং তজ্জন্য অন্তর্য্যামীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হই।

পাঠক, "গীতাঞ্জলির" আলোচ্য কবিতার প্রথমার্দ্ধে (১ম—১০ম ছত্র পর্য্যন্ত) পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত দৈন্যের, কপটতার আবরণ-লেশ-বিহীন, নিঃসঙ্কোচ প্রাণখোলা দৈন্যের প্রমাণ পাইবেন। অহঙ্কার (কর্ত্তৃত্বাভিমান) তাহার হৃদয়ের কোণে উঁকি মারিয়া প্রভুর চরণে তার মস্তকটি ভক্তিভরে অবনমিত হইতে দিতেছেনা। তাই কবি অসঙ্কোচে বলিতেছেন—

> "আমার মাথা নত করে দাও হে
> তোমার চরণ ধূলারতলে
> সকল অহঙ্কার হে আমার", ইত্যাদি।

আর—

> "নিজেরে করিতে গৌরব দান
> নিজেরে কেবলি করি অপমান,

আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া

ঘুরে মরি পলে পলে।" এই কয় পংক্তিতে ভক্তকবি তার "মনের গোপনের" কোন কথা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন কি? ইহার নাম যদি দৈন্য না হয় তবে প্রকৃত দৈন্য কি?

"আমারে না যেন করি প্রচার

আমার আপন কাজে,

* * * * * * *

সকল অহঙ্কার হে আমার' ইত্যাদির সঙ্গে—

"নাম গানের এই ছদ্মবেশে দিই পরিচয় পাছে

মনে মনে মরি যে সেই লাজে।

অহঙ্কারের মিথ্যা হতে বাঁচাও দয়া করে

রাখ আমায় যেথা আমার স্থান!

আর সকলের দৃষ্টি হতে সরিয়ে দিয়ে মোরে

কর তোমার নত নয়ন দান।

আমার পূজা দয়া পাবার তরে,

মান যেন সে না পায় কারো ঘরে,

নিত্য তোমায় ডাকি আমি ধূলার পরে বসে

নিত্যনূতন অপরাধের মাঝে॥" পাঠ করিয়া কবির দীনতা দেখুন, এবং "আমারে যেন না করি প্রচার" এই বাক্যের অর্থ কি বুঝুন।

এ জাতীয় দৈন্যের ও সকল মলিনতা ধৌত করিয়া দিবার জন্য প্রভুর নিকট আকুল ক্রন্দনের দৃষ্টান্ত "গীতাঞ্জলিতে" বিরল নহে। যথা—

(১)

নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণ তলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন
নয়ন জলে।
একা আমি অহঙ্কারের
উচ্চ অচলে,
পাষাণ আসন ধূলায় লুটাও
ভাঙ সবলে।
কি লয়ে বা গর্ব্ব করি
ব্যর্থ জীবনে!
ভরাগৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে।
দিনের কর্ম্ম ডুবেছে মোর
আপন অতলে,
সন্ধ্যা বেলার পূজা যেন
যায়না বিফলে!
নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণ তলে।

(২)

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে!
তোমায় দিতে পূজার ডালি
বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,
পরাণ আমার পারিনে তাই পায়ে থুতে।

এত দিনত ছিলনা মোর কোন ব্যথা,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা।
আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়োনা গো দিয়ো না আর ধূলায় শুতে।

আবার--

এবার তুমি ফিরো না হে--
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ।

* * * *

কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনো যে আছে বাকি
মনের গোপনে.
আমায় তার লাগি আর ফিরায়ো না,
তারে আগুন দিয়ে দহ॥

আবার—

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা-ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়
গীতসুধা-রসে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধূলায়
অন্ধকরিয়া অবোধে ভুলায়,
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র আলোকে এসো।

পুণশ্চ——

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে

আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল,
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে।
পূজাগৌরব, পুণ্যবিভব
কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে
লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশি সাজে নাই গেহ,
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া
ভাঙ্গা মন্দির দ্বারে॥

আর—

অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন করে
আমার যত কালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দাহন জ্বালো।

পাঠক, আর কত কবিতা উদ্ধার করিব?
আর দুটা দৃষ্টান্ত দেই...

(১)

নামটা যে দিন ঘুচাবে নাথ

বাঁচব সে দিন মুক্ত হয়ে—
আপনগড়া স্বপন হ'তে
তোমার মধ্যে জনম লয়ে।
ঢেকে তোমার হাতের লেখা
কাটি নিজের নামের রেখা,
কত দিন আর কাট্‌বে জীবন
এমন ভীষণ আপদ বয়ে।
সবার সজ্জা হরণ করে
আপনাকে সে সাজাতে চায়।
সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে
আপ্‌নাকে সে বাজাতে চায়।
আমার এ নাম যাক্‌ না চুকে,
তোমারি নাম নেব মুখে,
সবার সঙ্গে মিলব সে দিন
বিনা-নামের পরিচয়ে।

আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে
মরচে সে এই নামের কারাগারে।
সকল ভুলে যতই দিবারাতি
নামটারে ঐ আকাশ পানে গাঁথি,
ততই আমার নামের অন্ধকারে
হারাই আমার সত্য আপনারে॥

* * * *

যতন করি যতই এ মিথ্যারে
ততই আমি হারাই আপনারে॥

পাঠক, এ সকল কবিতার সরল সৌন্দর্য্য ও প্রাণস্পর্শিতা

হৃদয় দ্বারা অনুভব করুন। কোন টীকাটিপ্পনি দ্বারা এ সকলের সৌন্দর্য্যবোধে ব্যাঘাত জন্মাইব না। তবে পাঠককে এই মাত্র স্মরণ করাইয়া দিব যে "গীতাঞ্জলির" ১ম কবিতায় ব্যবহৃত 'প্রচার' শব্দের ভিতরকার অর্থ এবং মানুষের দুই 'আমিতে' যে দ্বন্দ্বের কথার তথায় উল্লেখ আছে তাহা উক্ত উদ্ধৃতাংশদ্বয়ে কত সুস্পষ্ট হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবেন। আর, দীনতা সম্পর্কে "গীতাঞ্জলি" হইতে—"এই মলিন বস্ত্র ছাড়্‌তে হবে," "যতবার আলো জ্বাল্‌তে চাই," "আর আমায় নিজের শিরে বইব না," "তারা দিনের বেলা এসেছিল," "জড়ায়ে আছে বাঁধা," "ধনে জনে আছি জড়ায়ে," "গর্ব্ব করে নিইনে," "মানের আসন, আরাম শয়ন," "নিন্দা দুঃখে অপমানে," "জড়িয়ে গেছে সরু-মোটা," "গাবার মত হয়নি কোন গান," "তোমার সাথে নিত্য বিরোধ" প্রভৃতি গান গুলিও পাঠ করিবেন।

উপরি উদ্ধৃত কবিতাগুলি হইতে পাঠক ইহাও দেখিবেন যে আমাদের কবির ভগবানের নিকট যাচ্‌ঞা আছে, কিন্তু বঞ্চনা নাই, দীনতা নম্রতা আছে, কিন্তু হীন ভীরুতা নাই। "মানের আসনে" উপবেশন করাইয়া, "আরাম শয়নে" শায়িত রাখিয়া মুক্তির অক্ষয় ধামে পঁহুছাইয়া দিবার জন্য তার প্রার্থনা নহে। পক্ষান্তরে, তার প্রার্থনা—সর্ব্বশক্তিমান্ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া "রুদ্র আলোকে" "বাসনার বিপুল ধূলার" গাঢ় অন্ধকার দূর করিয়া দেন,—দুঃখ-বজ্রের "তীব্র দাহনে" তার যত 'কালো,' যত শ্যামিকা দগ্ধ করিয়া তার বিশুদ্ধ স্বর্ণের দীপ্তিকে উন্মুক্ত উজ্জ্বল করিয়া দেন। আত্মার এই স্বাভাবিক বীরত্বই অমৃতের পথে যাত্রীর প্রধান সম্বল। যেহেতু—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" অর্থাৎ বীর্য্যহীন ব্যক্তি এই

আত্মাকে লাভ করিতে পারেনা।

অতঃপর ভগবানের 'স্তুতির' কথা। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্রহ্মসঙ্গীত এই ভগবদ্‌গুণাবলীর বর্ণনা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। কবির রচিত ধর্ম্মসঙ্গীত আজ আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ও আদৃত। তাই ইহার পরিচয় দিতে যাওয়া অনাবশ্যক।

ভক্ত যখন ভগবানের নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন তখনই তার হৃদয়ে করুণাময়ের অপার মাহাত্ম্য ও অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা আপনা আপনি জাগিয়া উঠে। তাই প্রায়শঃ প্রার্থনা ও ভগবদ্‌-গুণখ্যাপন একসঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে দেখা দেয়। এরূপ প্রার্থনা "গীতাঞ্জলি" হইতে দু একটা শুনুন :—

(১)

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।
এস গন্ধে বরণে এস গানে।
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে
এস চিত্তে সুধাময় হরষে,
এস মুগ্ধ মুদিত দু নয়নে।
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।
এস নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এস এস হে বিচিত্র বিধানে।
এস দুঃখে সুখে এস মর্ম্মে,
এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে,
এস সকল কর্ম্ম অবসানে।
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে॥

(২)

অন্তর মম বিকশিত কর,
অন্তরতর হে।
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর
সুন্দর করহে।
জাগ্রত কর, উদ্যত কর,
নির্ভয় কর হে।
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে।
অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে॥
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণ-পদ্মে মম চিত্ত নিস্পন্দিত কর হে,
নন্দিত কর, নন্দিত কব
নন্দিত কর হে॥
অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে॥

(৩)

আমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে
সত্য হবে—
ওগো সত্য, আমার এমন সুদিন
ঘট্‌বে কবে!
সত্য সত্য সত্য জপি,

সকল বুদ্ধি সত্যে সঁপি,
সীমার বাঁধন পেরিয়ে যাব
নিখিল ভবে,
সত্য, তোমার পূর্ণ প্রকাশ
দেখ্‌ব কবে।

* * * *

আমার আমি ধুয়ে মুছে,
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে,
সত্য, তোমায় সত্য হব
বাঁচব তবে,—
তোমার মধ্যে মরণ আমার
মরবে কবে॥

(৪)

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়-পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।
তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলি যায় খুলে,—

বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাইত ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

(৬)

দয়া করে ইচ্ছা করে আপ্‌নি ছোট হয়ে
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্য্য সুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা,
জলে স্থলে দাও যে ধরা
কত আকার লয়ে।

পাঠক, নিম্ন লিখিত কবিতাটিতে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও ভক্তের দীনতা বর্ণনার অপূর্ব্ব মিলন দেখিয়া মোহিত হইবেন—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্ খানে যায় থামি,
তোমাব চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে

সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

অহঙ্কার ত' পায়না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

"গীতাঞ্জলির" ১৩৮-১৩৯ পৃঃ 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে' এই সুদীর্ঘ কবিতাটিও এই সঙ্গে পঠনীয়। এ প্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থের নিম্নোলিখিত কবিতা গুলিও, পাঠক, বিশেষ-ভাবে পাঠ করিবেন :—

"বাঁচান বাঁচি মারেন মরি," "জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দ-গান বাজে" "এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়-হরণ," "আলোয় আলোকময় কর হে," "আকাশ তলে উঠ্‌ল ফুটে," "হেথায় তিনি কোল পেতেছেন," "রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করে," "তোমার প্রেম যে বইতে পারি," "বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি" প্রভৃতি।

পাঠক, উদ্ধৃত কবিতা গুলিতে সেই অমৃতস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, স্ব-প্রকাশ, সর্ব্বময়, প্রেমময়, লীলাময়, শক্তি-সাগর, সীমাতীত পুরুষোত্তমের কি মাধুর্য্যময়ী বর্ণনা কবির, হৃদয়ের ভাষায় দেখিতে পাইলেন! ইহার অনুপম সঙ্গীতে

তোমার দ্বৈত ও অদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদের বিরোধ-কোলাহল শান্ত হইয়া যায় নাকি এবং তোমাকে একমাত্র প্রেমানন্দ-সাগরের অতল তলে নিমজ্জিত করিয়া দেয় না কি? এই সঙ্গীত যদি "শুষ্ক প্রার্থনা" হয়, ইহা যদি "ভারতীয় সাধন পদ্ধতির" বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাও, তবে বলিব দুরদৃষ্ট বশে ভারতীয় "সাধন পদ্ধতির" মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছ না। আর, আলোচ্য কবিতার--

যাচিছে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে

এই প্রার্থনায় ও কি সেই পরম শান্তিস্থান, হৃদ্-বিহারী হরির, সেই আনন্দঘন পরমসুন্দরের ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যের বর্ণনা নাই যাঁহাকে উপনিষৎ "রসো বৈ সঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন? বাস্তবিক, একটু ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে আলোচ্য কবিতা-টিতে সমস্ত "গীতাঞ্জলি" যেন বীজাকারে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ গ্রন্থে ভক্ত-কবি-হৃদয়ের যত কিছু সুগন্ধি কুসুম রাশি ফুটিয়া উঠিয়া ভগবচ্চরণে অঞ্জলি স্বরূপে নিবেদিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই যেন এই প্রথম কবিতার স্বল্প পরিসরের মধ্যে মুকুলিতাবস্থায় নিহিত রহিয়াছে। এ জন্যই কেবল একটি কবিতার মর্ম্ম সুস্পষ্ট করিতে গিয়া গ্রন্থের অন্যত্র হইতে এত কবিতা উদ্ধৃত ও এত কবিতার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

এক্ষণে ভগবানের সঙ্গে মায়িক সম্বন্ধ সম্বন্ধে "সুরমার" সমালোচক মহাশয় যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহাই আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে যাহারা সামান্য ভাবে

ও পরিচিত তাহারা সকলেই জানেন যে তাঁহার কাব্যের মর্ম্ম-কথা—

"যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা" অথবা "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা"। এই সর্ব্বগ্রাহী প্রেমই—"যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে"—কবিকে সমুদায় বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে, সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিতে শিখাইয়া সর্ব্বশেষে সেই সর্ব্বমূলাধার প্রেমময়ের পাদ-পদ্মের সমীপে পঁহুছাইয়া দিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যের আদ্যন্তে এই এক প্রেমগীতিই নানাভাবে, নানা ভঙ্গীতে, নানা ছন্দে নানা রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আর, কবি-হৃদয়ের এই তীব্র প্রেম-তৃষ্ণাই তাঁহাকে বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যের প্রেমভক্তি-মন্দাকিনীর অতলস্পর্শী পূতবারিতে অবগাহন করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। এমতাবস্থায় যদি প্রকৃত পক্ষেই এই ভক্ত-কবির প্রার্থনা গুলি শুষ্ক নীরস হয়, যদি তাহাতে বৈষ্ণব সাহিত্যের মধুরাদিভাবের কোন ভাবেরই অঙ্কপাত না হইয়া থাকে, তবে এতদপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর কিছু কল্পনা করিতে পারি না। তাই বিষয়টা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথমেই কবির ১৫। ১৬ বৎসর বয়সে রচিত "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" নামক ললিতমধুর কবিতা গুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করি। বৈষ্ণব কবিদের কাব্য আমাদের প্রেমিক কবির তরুণ হৃদয়ে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার প্রথম ফল ঐ পূর্ব্বোল্লেখিত পদাবলী। অবশ্যই ইহা স্বীকার্য্য যে তরুণ বয়সের উক্ত রচনায় ভাবের গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা হৃদয়ের উদ্দাম আবেগ অধিক, মৌন-প্রেমের প্রশান্ত আত্মবিস্মৃতি অপেক্ষা মুখর শ্রুতিমধুর কলসঙ্গীত

অধিক। কিন্তু যে পাঠকের সঙ্গীতের কাণ আছে তিনি ঐ প্রেমগীতির মাধুর্য্যে, তার পদলালিত্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। আর, এই গ্রন্থে খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীলেখার ন্যায় যে চঞ্চলনৃত্যশালিনী প্রেমপ্রবাহিনীর পরিচয় পাই তাহাই সংসার পথের সকল বাধা বিঘ্নের শৈলরাশি অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া নানা অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট হইয়া অবশেষে যখন অনন্তপ্রেম-পারাবারের সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছে তখনকার তার অতলস্পর্শী গভীরতা, ধীরস্থির প্রশান্ততা অথচ প্রেমসাগরে অঙ্গ ঢালিয়া আত্মসমর্পণ করিবার জন্য তার অটল অচঞ্চল ব্যাকুলতা যদি দেখিতে চান তবে পাঠক "গীতাঞ্জলির" আগাগোড়া পাঠ করুন। এই প্রসঙ্গে "গীতাঞ্জলির" ১৫ পৃঃ, ২৩ পৃঃ, ২৪ পৃঃ, ২৫ পৃঃ, ২৮ পৃঃ, ২৯ পৃঃ, ৩১ পৃঃ, ৩৩ পৃঃ, ৩৪ পৃঃ, ৩৯ পৃঃ, ৪১ পৃঃ, ৪২-পৃঃ, ৪৫ পৃঃ, ৫১ পৃঃ ৫২ পৃঃ, ৫৬ পৃঃ, ৬৬ পৃঃ, ৬৭ পৃঃ ৭২ পৃঃ, ৭৩ পৃঃ, ৭৪ পৃঃ, ৭৫ পৃঃ, ৮০ পৃঃ, ৮৩ পৃঃ, ১০১ পৃঃ, ১৫০ পৃঃ, ১৫১ পৃঃ ও ১৫৩ পৃষ্ঠার কবিতাগুলি পাঠ করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। ঐ সকল কবিতা পাঠ করিয়া কবির প্রেমাস্পদের জন্য পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ, বিরহের তীব্রতা, ধীরতা, মধুরতা ও তন্ময়তা এবং মিলনানন্দের পরিচয়—এককথায়, মধুরভাবের সাধনার পরিচয় গ্রহণ করুন।

V

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব ও তজ্জনিত মাধুর্য্যরসের প্রাচুর্য্য যে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয় তাহা ইঙ্গিতে পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে ঐ বিষয়টাই

একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রেমই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মর্ম্মকথা—প্রেমের সাধনাই তাহার সাধনা। আমার মনে হয় প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণই আমাদের এই আধুনিক প্রেমিক কবির এ বিষয়ে দীক্ষা-গুরু। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস যে চক্ষে প্রেমকে দেখিয়াছেন আমাদের কবির প্রেম-দৃষ্টিও তদনুরূপ।

চণ্ডীদাসের প্রেমের গান——

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল "রী"॥
পুনঃ যে মথিয়া অমিয়া হইল,
তাহে ভিজাইল "তি"।
সকল সুখের এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥

* * * *

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে

পিরীতি সহজ কথা?

বিরিখের ফল নহেত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন, লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান্ সে॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥

আবার—

পিরীতি সরসে সিনান করিব,
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব॥

এই সর্ব্বগ্রাহিনী পিরীতি কবি রবীন্দ্রনাথের মরমে কি ভাবে পশিয়াছে, এই "পিরীতি অঞ্জন" তাহার নয়নে লাগিয়া তাঁহাকে কি দিব্য দৃষ্টি দান করিয়াছে, 'পিরীতি সরসে সিনান' করিয়া কিরূপে তিনি পিরীতির সাধনা করিয়াছেন তাহা কবির কাব্য-গ্রন্থের পাঠকগণ অবগত আছেন। কবির ঐ সাধনার ইতিহাসের

ধারা অনুসরণ করিতে হইলে,—তাঁহার প্রেম কিরূপে কৈশোরে ও তরুণ যৌবনে বাহ্য প্রকৃতির সংস্পর্শে এক অব্যক্ত অস্পষ্ট, মোহ জড়িত আকুলতারূপে উন্মেষিত হইয়া, যৌবনে নারীপ্রেমের মধ্য দিয়া বিকসিত হইয়া, তাহার সসীমতা, পঙ্কিলতা অতিক্রম করিয়া, সমস্ত জলস্থল আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির জীব জন্তু তরু লতাগুল্ম জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঙ্গে আত্মীয়তা, একাত্মতা অনুভব করিয়া, অবশেষে বার্দ্ধক্যে সর্ব্বপ্রেমাধার সেই আনন্দস্বরূপ একের পাদ-পদ্মে অঙ্গ ঢালিয়া সার্থক হইতে চলিয়াছে তাহা সম্যক্ প্রদর্শন করিতে হইলে রবি বাবুর সমগ্র কাব্যের আলোচনা করা আবশ্যক। যে উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধের সূচনা তাহাতে এরূপ আলোচনার অবসর ইহাতে করিয়া লওয়া অসম্ভব। তবে ইহা এস্থলে বলা আবশ্যক যে "নৈবেদ্য" ও "গীতাঞ্জলিতে"ই কবির পিরীতির সাধনার চরম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রেমিক-চূড়ামণি চণ্ডীদাসের দীক্ষায় আমাদের কবির পিরীতিই ধরম, পিরীতিই করম। পিরীতি ভিন্ন তাঁর অন্য পূজা-য়োজন নাই—এই পিরীতিকেই তিনি দেব-পূজার পুষ্প-চন্দন, তন্ত্র মন্ত্র জপ করিয়াছেন। তাই—

> মান দিব যে তেমন মানী
> নইত আমি,
> পূজা করি সে আয়োজন
> নাইত স্বামী।
> যদি তোমায় ভালবাসি,
> আপনি বেজে উঠবে বাঁশি
> আপনি ফুটে উঠ্‌বে কুসুম

কানন-ভরে।

"দয়া করে দাও ধরা, ত
রাখব ধরে॥

তাই—

মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে,
বন্ধু বলে ডাকি মোর প্রভুকে।
বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।

ঐ প্রেমের—

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহির মনে
চির দিবস মোর জীবনে।
নিয়ে গেছে গান আমারে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে,
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই
এই ভুবনে।
কত শেখা সেই শেখালো,
কত গোপন পথ দেখালো,
চিনিয়ে দিল কত তারা
হৃদ্ গগনে।
বিচিত্র সুখ দুঃখের দেশে
রহস্যলোক ঘুরিয়ে শেষে
সন্ধ্যা বেলায় নিয়ে এল
কোন্ ভবনে।

এই পিরীতির মন্তরই কবির নিকট সাধনার সকল রহস্য-

লোকের' দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তাঁহাকে মুক্তির বিচিত্র 'গোপনপথ' দেখাইয়া দিয়াছে. এই প্রেমের আকর্ষণেই তিনি 'ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে' ঘুরিয়া 'পরকে আপন' করিয়া 'পরেতে মিশিতে' পারিয়াছেন।

কিন্তু কবি জানেন যে তাহার প্রেমাস্পদ অনন্ত প্রেমপারাবার স্বরূপ এবং তাঁহার প্রেমলীলা আদ্যন্তবিহীন—

তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই,
বারে বারে নূতন লীলা তাই।
আবার তুমি জানিনে কোন বেশে
পথের মাঝে দাঁড়াবে নাথ হেসে,
আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে,
লাগবে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোর।
তোমায় খোঁজা শেষ হবেনা মোর,
যবে আমার জীবন হবে ভোর। *

---

* Cf.—সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়!
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানইতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নেহারল,
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল,
শ্রুতি পথে পরশ ন গেল॥
কত মধু যামিনি রভসে গমাওল,
ন বুঝল কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল,
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল॥
—বিদ্যাপতি।

কিন্তু এজন্য কবি নৈরাশ্যাহত হইয়া পড়েন নাই, পরন্তু নারদাদি ভক্তশ্রেষ্ঠগণ যেমন নির্ব্বান মুক্তি উপেক্ষা করিয়া প্রেমময় ভগবানের লীলা-রস-সুধায় বিভোর হইয়া, লোকহিতরূপ তাঁর প্রিয়কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করা শ্রেয়স্কর মনে করিতেন, সেইরূপ তিনিও সেই প্রেম-লীলাপূর্ণ অন্তহীন জীবনের আশায় উল্লসিত—

চলে যাব নবজীবনলোকে,
নূতন দেখা জাগ্‌বে আমার চোখে,
নবীন হয়ে নূতন সে আলোকে
পরব তব নবমিলন ডোর
তোমায় খোঁজা শেষ হবেনা মোর॥

চণ্ডীদাস প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন—

এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।

তাঁহার কাব্যের নায়িকাকে এই পিরীতির রীতির বশে অবশেষে প্রেমের যোগিনী সাজিয়া 'ঘরে অনল ভেজাইবার' সঙ্কল্প করিতে দেখিয়াছি—

দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
কালমাণিকের মালা গাথি নিব গলে।
কানুগুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাধা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥

আর, আমাদের কবির সঙ্কল্প—

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে

প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে?
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
ফিরব ধেয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে।

অর্থাৎ 'আপনা ভুলিয়া' প্রেমের যোগী সাজিয়া কর্ম্মযোগের দ্বারা বিশ্বসংসারকে 'পিরীতির ডুরে' বাঁধিয়া যে "প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে' তাঁহার সঙ্গে মিলিবার জন্য 'একলা ঘরের আড়াল ভেঙ্গে' বাহির হইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন।

তাই প্রার্থনা—

ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কাণে, তোমার কাণে, তোমার কাণে।

* * * *

যত বাধা সব টুটে যায় যেন
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর,
এ জীবনে যা কিছু সুন্দর
সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে
প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে।

কারণ,—

মরে গিয়ে বাঁচব আমি তবে,

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমার এক প্রেমে,
দুঃখ সুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে॥

তাই প্রেমের সাধক রবীন্দ্রনাথ এই তথা-কথিত বৈরাগ্য-প্লাবিত, জড়দশাপ্রাপ্ত, কর্ম্মলেশহীন বর্ত্তমান ভারতকে শিক্ষা দিয়াছেন—"যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।" আর বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্ম প্রচার করিয়া বলিয়াছেন—

"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

প্রেমের এই 'রীতি'—এই দেব মানবের একীকরণ, দেবতার মানবীকরণ ও মানবের দেবীকরণ, পাঠক, প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসে ও আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথে দেখিলেন। আর, প্রেমাস্পদের জন্য এই প্রেম প্রেমিকাকে কি প্রকারে সর্ব্বত্যাগিনী করিয়া যোগিনী সাজাইয়া, কলঙ্কের ছাই অঙ্গের ভূষণ করিয়া ঘরের বাহির করিয়া দেশে দেশে ভ্রমন করায় তাহাও উপরে দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু যখন ঐ সর্ব্বত্যাগী প্রেমের আকর্ষণে প্রেমিক নাগর নিজের উচ্চপদবী হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া উপস্থিত হন, তখন প্রেমিকা 'কলঙ্কের ডালি' সানন্দে মাথায় করিয়া নিজেকে নিঃশেষে তাঁর চরণে নিবেদন করিয়া পূর্ণভাবে সর্ব্ব ত্যাগিনী হন। তাই যখন ঘোর রজনীর মেঘের ছটায় 'আঙ্গিয়ার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে' দেখিয়া চণ্ডীদাসের রাধিকার পরাণ ফাটিতেছে তখন তিনি বলিতেছেন—

সই, কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলিল মোরে॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে;
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
অনল ভেজাই ঘরে॥

কারণ, সে বঁধুয়া—

"আপনার দুখ সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী"

বলিয়া তখন অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ঐ বিশ্বাস—তার প্রতি যে প্রেমময়ের অটল প্রীতির আকর্ষণ রহিয়াছে সে বিশ্বাস ও তজ্জনিত আনন্দ কিরূপ তার প্রমাণ—

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অপরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।
তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে,—

বিশ্ব-সাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।

* * * *

তাই তোমার আনন্দ আমার পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চল্‌ছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।
তাইত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরচ কত মনোহর বেশে,
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।
তাইত, প্রভু, যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

আর, এই 'যুগল-সম্মিলনের' পরম আনন্দে চণ্ডীদাসের নায়িকার ন্যায় আমাদের প্রেমিক কবিও নিঃসঙ্কোচে বলিতেছেন

নিন্দা পরব ভূষণ করে,
কাঁটার কণ্ঠহার,
মাথায় করে তুলে লব
অপমানের ভার;

দুঃখীর শেষ আলয় যেথা
সেই ধূলাতে লুটাই মাথা,
ত্যাগের শূন্য পাত্রটি নিই
আনন্দ-রস ভারে।

পিরীতির ধর্ম্মই এই, ইহা প্রথমে প্রেমিক বা প্রেমিকার, হৃদয়ে দারুণ দুঃখের "হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়ানি" জ্বালাইয়া অসহনীয় বিরহাগ্নিতে সকল স্বার্থের ও বাসনার মালিন্য পোড়াইয়া ত্যাগের দ্বারা পবিত্র করে এবং অবশেষে তাহাকে পূর্ণ মিলনের ভূমানন্দে পঁহুছাইয়া দিয়া চরিতার্থতা দান করে। তাই ভারতীয় ঋষিগণ বলিতেছেন বাহ্যবস্তুর সকল জঞ্জালের ত্যাগ দ্বারাই আত্মার প্রকৃত অমরত্ব লাভ হয়। তাই আমাদের কবি ঐ ত্যাগের সাধনাকে, বেদনার সাধনাকে বরণ করিয়াছেন—

চির জনমের বেদনা,
ওহে চিরজীবনের সাধনা!
তোমার আগুন উঠুক্ হে জ্বলে,
কৃপা করিয়ো না দুর্ব্বল বলে,
যত তাপ পাই সহিবারে চাই,
পুড়ে হোক্ ছাই বাসনা।

অমোঘ যে ডাক সেই ডাক দাও
আর দেরি কেন মিছে?
যে আছে বাঁধন বক্ষ জড়ায়ে
ছিঁড়ে পড়ে যাক্ পিছে।
গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক্ এবার,
গর্ব্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া

জাগুক্ তীব্র চেতনা।

তাই কবি 'মানের আসন, আরম শয়ন' ছাড়িয়াছেন এবং দুঃখের বজ্র নির্ঘোষের মধ্যে প্রেমাস্পদের বাঁশরী নিনাদ শুনিয়াছেন—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুলবনা আর সহজেতে,—
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্ত বীণার তারে,
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে,
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান্॥

পিরীতির এই দারুণ সাধনায় দুঃখের বজ্র ঝড়কে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাস্পদের জন্য সর্ব্ব সুখ-দুঃখ সহিত সমগ্র আত্ম-বিসর্জ্জনের জন্য সঙ্কল্প দেখুন—

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে,
তাই যে তোরে বারে বারে

ফিরতে হল, গেলি ভুলে ?
ডাকরে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা তোমার যাক্ ভেসে যাক্,
জীবনখানি উজাড় করে
সঁপে দে তাঁর চরণ-মূলে।

বাস্তবিক, প্রেম হইতে যে ত্যাগ ও আত্মসমর্পণ আসে তাহাই সেই প্রকৃত সন্ন্যাস যাহাতে সাধক সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও সুখে দুঃখে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া থাকেন। আর, সংসারের ভয়ে ভীত হইয়া, হৃদয় নিহিত প্রেমের তৃষ্ণাকে বুভুক্ষিত রাখিয়া নিজ ক্ষুদ্রতার কোণে বসিয়া যে প্রাণপণে বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রামকে নিগ্রহ করিবার অসাধ্য প্রয়াস (যাহাকে আমরা ভ্রান্তিবশতঃ বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত করি) তাহা স্বার্থপরতা ও ভীরুতার নামান্তর ও রূপান্তর মাত্র। তাই এরূপ বৈরাগ্য আমাদের অপমৃত্যু আনিয়া দেয়। এরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির নিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা বলিয়াছে—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
বিষয়-নিবৃত্ত মাত্র হয় নিরাহারিগণ,
বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে ব্রহ্মদর্শী জন।

বস্তুতঃ, প্রকৃতি পুরুষের, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান দ্বারা মানব পরম শান্তিস্থান লাভ করিতে পারে বলিয়া গীতা ও সাংখ্য দর্শন উপদেশ দিয়াছেন উক্ত জাতীয় বৈরাগ্য-পন্থী সাধকগণের সে জ্ঞান লাভের দ্বার রুদ্ধ হইয়া পড়ে। * এই জাতীয় বৈরাগ্যের

* ইহা স্বীকার্য্য যে প্রকৃতিতে (চণ্ডীদাসের ভাষায়) 'বিষামৃতে একত্রে রয়,' এবং এজন্য প্রকৃতির মোহের বিষে দুর্ব্বল-

নিষ্ফলতা রবি বাবুর "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামক নাট্য কাব্যে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ইহারই প্রতিবাদ করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়!
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার †
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়' প্রদীপের মত

চিত্ত সাধকের প্রাণনাশের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাই যাহাদের অটলা আস্তিক্যবুদ্ধি ও অচলা ভক্তি নাই তাহারা প্রকৃতির ভয়ে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় লয়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। প্রেমিক চণ্ডীদাস এ তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

যেমত দীপিকা উপরে অধিকা,
ভিতরে অনল শিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া,
পুড়িয়া মরয়ে পাখা॥
জগত ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন, সে করয়ে পান,
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥
হংস চক্রবাক, ছাড়িয়া উদক,
মৃণাল-দুগ্ধ সদা খায়।
তেমতি নহিলে, কোথা প্রেম মিলে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

† Cf——বারবার তুমি আপনার হাতে
স্বাদে গন্ধে ও গানে

সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে! ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার!
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে!
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া!

বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর মাঝ খানে।
পিতা মাতা, ভ্রাতা, প্রিয় পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি
তুমি আছ মোর সাথ!
সব আনন্দ মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ!

কারণ,—রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎযদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ
হ্যেবানন্দয়াতি॥

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

* চণ্ডীদাস ও সাক্ষ্য দিয়াছেন—

এগার আখরে মূলতত্ত্ব জানিলে
একটি আখর হয়।

অর্থাৎ মন ও দশেন্দ্রিয় দ্বারা সেবারূপ মূলতত্ত্ব অভ্যাস হইলে
পর একমাত্র আনন্দ-স্বরূপকে লাভ করা যায়।

তাই কবির ভৎসনা—

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে!
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করচে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাট্‌চে যেথায় পথ
খাট্‌চে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁর মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার পরে।

(৬৪ পৃঃ পাদটীকার শেষাংশ)

এই সেবার দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতিতে দেখুন—

হরি যব আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তূর॥
আলিপন দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥
সহকার পল্লব চুম্বন দেব।
মাধব সেবি মনোরথ লেব॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন নিরে করব অভিষেকে॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রসতন্ত্র।
মূরুখ না বুঝএ বুঝ গুণমন্ত্র॥

তাই বৈরাগ্যে—

মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন পরে,
বাঁধা সবার কাছে।

অতএব—

রাখরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি,
কর্ম্ম-যোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।

কারণ, নিখিলশরণ দরিদ্রের ভগবান্ কবির ভাষায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন—

জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহদিলে আমি থাকি ঘরে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের সাধনার পরিণাম-গতি এতক্ষণ আলোচনা করিয়া আমরা কি দেখিলাম ? দেখিলাম, সেই প্রাচীন ভারতের ঋষির বাক্য——

ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ ধনম্॥ *

তিনি জীবনে সফল করিয়াছেন—প্রেমের প্রদীপালোক সংসারের তিমিরঘনদুর্গম পথে বিচরণ করিয়া সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা প্রেমপারাবারের কূলে পঁহুছিয়াছেন—জীবনে ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য করিয়াছেন।

যা আছে আমার সকলি কবে
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে !

---

* সর্ব্ব বিশ্ব চরাচরে পরম ঈশ্বর
ব্যাপ্ত হয়ে বিদ্যমান্, তাঁহারই কর
করিল প্রদান যাহা ভুঞ্জ তুমি তাই ;—
ত্যজ অন্য লোভ, ধন অন্য তব নাই।

সব ছেড়ে সব পাব তোমায়
মনে মনে মন তোমারে চায়।

এই বাক্য গুলি ঐহিক ও পারমার্থিকের নির্ব্বিরোধিতা সপ্রমাণ করিতেছে। ইহাই ভারতের শিক্ষা—

—"স্বার্থ ত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

তাই—

এই মোর সাধ যেন এ জীবন মাঝে
তব আনন্দ মহাসঙ্গীতে বাজে।
তোমার আকাশ, উদার আলোক ধারা
দ্বার ছোট দেখে ফেরেনা যেন গো তারা,
ছয় ঋতু যেন সহজ নৃত্যে আসে
অন্তরে মোর নিত্য নূতন সাজে।
তব আনন্দ আমার অঙ্গে মনে
বাধা যেন না হ পায় কোন আবরণে।
তব আনন্দ পরম দুঃখে মম
জ্বলে উঠে যেন পুণ্য আলোক সম,
তব আনন্দ দীনতা চূর্ণ করি,
ফুটে উঠে ফেটে আমার সকল কাজে॥

তাই— মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে
এই ইচ্ছাটি সফল কর প্রাণে।
কেবল থাকা, কেবল চেয়ে থাকা,
কেবল আমার মনটি তুলে রাখা,
সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষায়
সকল দিনের কাজেরি মাঝখানে।
নানা ইচ্ছা ধায় নানাদিক পানে,
একটি ইচ্ছা সফল কর প্রাণে।
সেই ইচ্ছাটি রাতের পরে রাতে
জাগে যেন একের বেদনাতে,

দিনের পরে দিনকে যেন গাঁথে
একের সূত্রে এক আনন্দগানে ॥

পাঠক, "সুরমার" সমালোচক ভক্ত-কবির প্রাণের এই পরম ইচ্ছার প্রতিই বিদ্রূপকটাক্ষ করিয়াছিলেন তাহা বোধ করি স্মরণ আছে। এই ইচ্ছাই সেই লীলাময়ের ইচ্ছার বিকাশ যাহা তিনি লীলাবশে মানবের জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া বিচিত্র প্রণালীতে পূর্ণ করিয়া থাকেন।

আজিকার ভারত তার সেই প্রাচীন শিক্ষা—যাহা তপোবনের নিবিড় শান্তির সঙ্গে নগরজনপদের কর্ম্ম-কোলাহলকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল—ভুলিয়া তার অন্তরের অমূল্য সম্পদ্ হারাইয়াছে,—তাই বৈরাগ্যের নামে ভীরু স্বার্থ প্রেমের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে,—তাই আজ ভারতে কর্ম্মের উৎস শুষ্ক হইয়া গেছে, ধর্ম্ম প্রাণহীন আচারে, ধ্যান-বল অর্থহীন জপ মাত্রে পরিণত হইয়াছে। একদিকে ঋষি-শিষ্য কবি রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যদিকে আধুনিক ভারতের শঙ্করাচার্য্য, ধর্ম্মবীর বিবেকানন্দ সেই প্রাচীন ভারতের বিস্মৃতপ্রায় অমৃতবাণী বিবিধ ভাষায় ও ছন্দে প্রচার করিয়াছেন। সুপ্ত ভারত কি ঐ বাণীর ঝঙ্কারে কোন 'পরম পরিপূর্ণ প্রভাতে, নব জীবনের সাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিবে না? আমরা আশাদৃপ্ত হৃদয়ে সেই 'ব্রহ্মমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায়' ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছি।

শান্ত, দাস্য প্রভৃতি যে পাঁচ প্রকার প্রেমের সাধনার কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে শান্ত, দাস্য ও মধুর ভাবের পরিচয় আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই। শেষোক্ত ভাবটির কিঞ্চিৎ অনুসরণ পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করিতে চেষ্টা করিব।

VI

ওই—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,

সে কি সহজ গান?

সেই সুরেতে জাগব আমি

দাও মোরে সেই কান।

এই বজ্রের বাঁশরীর তান বস্তুতই কবির কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল করিয়াছে—তাই তিনি দিগ্বিদিক ভুলিয়া, ভালমন্দ বিচার না করিয়া অন্ধ আবেগে যেন কোন অজানিতের আকর্ষণে ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন—

যাত্রী আমি ওরে,

পারবে না কেউ রাখ্‌তে আমায় ধরে।

দুঃখ সুখের বাঁধন সবই মিছে,

বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,

বিষয়-বোঝা টানে আমায় নীচে,

ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে,

যাত্রী আমি ওরে,

যা কিছু ভার যাবে সকল সরে।

আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে

ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,

সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে

কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে!

বজ্র নিনাদে মুরলীধ্বনি শুনিবার কথাটাকে কেহ কেহ হয়ত: শুধু কবি-সুলভ অতিশয়োক্তি মনে করিতে পারেন—ইহাকে ভক্ত জীবনের কোন সত্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ মনে না করিতে পারেন। কারণ, বিগত কয়েক মাস ধরিয়া "বিজয়া" নামক মাসিক পত্রের কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে যে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম সঙ্গীত গুলিতে

প্রকৃত আধ্যাত্মিক রস নাই—তাহাতে রসাভাস মাত্র আছে, ঐ সকল সঙ্গীত কোন প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হইতে নহে, পরন্তু মানস কল্পনা বা fancy হইতে উদ্ভূত। এক কথায়, উক্ত প্রবন্ধাবলীর লেখকের মতে কবির ধর্ম্ম সঙ্গীতে 'ভাব' (ভাবুকতা) আছে, আধ্যাত্মিক 'বস্তু' নাই। এই লেখকই তাঁর 'বস্তুতন্ত্রতার' অভিনব নিক্তিতে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য গ্রন্থাবলী ওজন করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে কবিবরের কাব্যে শ্রেষ্ঠ কবিতারূপ সারবস্তুর সংখ্যা অতি সামান্য। ঐরূপ কাব্যালোচনার সারবত্ত্ব কি তাহা শ্রীযুত অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় "প্রবাসী" পত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। এ প্রবন্ধে ঐ বিষয়ের পুনরালোচনা অনাবশ্যক এবং বিজ্ঞ লেখক রবিবাবুর ধর্ম্মবিষয়ক কবিতার যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া তার মূল্য নির্দ্ধারণ করার স্থান ও এ প্রবন্ধে নাই। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিব যে লেখকের ন্যায়বিচারের জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও উক্ত "বস্তুতন্ত্রতার' আকর্ষণই তাঁহার বিচারশক্তিকে সত্যভ্রষ্ট করিয়াছে। ধর্ম্ম সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার অধিকাংশ সত্য হইলেও যখন ঐ সকল কথাই রবীন্দ্রবাবুর ধর্ম্ম সঙ্গীতাদি সম্পর্কে প্রয়োগ করিতে গিয়াছেন তখনি, উপরোক্ত কারণে, তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন। সাধক-কবি রামপ্রসাদের সাধনা প্রকৃত ছিল, কি তাহা শুধু মানস কল্পনার ফাঁকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সাধনার আভাস বা ভেল্কান মাত্র ছিল তাহা আজ অথবা দুই শত বৎসর পরে বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে তাঁহার প্রণীত পদাবলী প্রভৃতিরই আলোচনা করিতে হইবে। তা না করিয়া যদি আমরা ভক্ত কবির সমসাময়িক ব্যক্তিদের তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতামত সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাব্য বিচারে প্রবৃত্ত হই তবে সাধক রামপ্রসাদের আন্তর জীবনের সাধনার পরিচয় না পাইয়া আমরা নিজেরাই বঞ্চিত হইব। কারণ, তাহা হইলে ভক্তপ্রবরের বাহ্য জীবন

সম্বন্ধীয় তাঁর সমসাময়িকদের অর্দ্ধসত্য অদ্ধভ্রান্ত একদেশিক বিভিন্ন ধারণা দ্বারা আমরা একজন কাল্পনিক রামপ্রসাদ গড়িয়া তুলিব মাত্র যাহার সঙ্গে প্রকৃত ভিতরকার রামপ্রসাদের হয়তঃ কোন সাদৃশ্যই থাকিবে না।' উক্ত লেখকের আলোচনার পদ্ধতি দেখিতেছি শেষোক্ত প্রকারের। রবিবাবুকে তিনি এবং বাহিরের লোক ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া জানেন বটে, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের যে অধিকারের সীমা তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যে রবিবাবু অতিক্রম করিয়া যান নাই তাহা কে বলিতে পারে, যদিও লেখক স্বয়ং এরূপ "কোনও প্রকারের প্রমাণ পরিচয়" না পাইতে পারেন? সাধনার প্রথমাবস্থায় অবিশ্বাস ও ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের আক্রমণ হইতে ধর্ম্ম বিশ্বাসের তরুণ চারাগাছটিকে রক্ষা করিবার জন্য সম্প্রদায়ের আচার নিয়মের বেড়া দেওয়ার আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায়না; কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায় যে তন্মধ্যস্থ যে কতিপয় সৌভাগ্যবান্ মহাত্মগণ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন তাঁহারা সম্প্রদায়-সৃষ্ট কৃত্রিম চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া সাধকদের যে এক সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক মিলন-ভূমি আছে তাহাতে উপনীত হন। ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ পাঠক ১৩২০ সালের মাঘ সংখ্যক "তত্ত্ববোধিণী পত্রিকায়" "সত্যের দীক্ষা" নামক প্রবন্ধে পাঠ করিয়া দেখিবেন তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত লেখকের সংস্কার কত ভ্রান্ত। ঐ প্রবন্ধে রবি বাবু আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—"কোন সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সঙ্কুচিত না হয়"। বস্তুতঃ পরকে চিনা বড়ই কঠিন ব্যাপার—আমরা অনেক সময়ই নিজের দ্বারা পরকে বিচার করিয়া থাকি। মনে হয় যে, উক্ত লেখকের মনে ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ সংস্কার দৃঢ়-মূল হইয়া রহিয়াছে এবং ঐ সংস্কারের দ্বারাই তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন ও ধর্ম্ম সঙ্গীত ও কবিতাকে খাঁট করিয়া দেখিতেছেন। এ সংস্কার মন হইতে দূর করিয়া যদি তিনি কবির সৃষ্ট সাহিত্যের ভাব ও

চিন্তা রাশি পূর্ব্বগত মহাত্মাদের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা দ্বারা পরথ করিয়া বিচারে অগ্রসর হইতেন তবে নিশ্চয় বলিতে পারি তাঁহার আলোচনার ফল ভিন্নরূপ হইত। কারণ, আধ্যাত্মিক বস্তু বা তত্ত্বের পরীক্ষা (test) কিসে? তুমি আমি সাধনার আত্মাক্ষরের মর্ম্ম পর্য্যন্ত অবগত নহি অথচ অসঙ্কোচে প্রচার করিতেছি এটা আধ্যাত্মিক বস্তু আর ওটা অবস্তু (fancy)। যাঁহারা স্বীয় জীবনের সাধনার দ্বারা ভগবদ্ তত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই মাত্র প্রকৃতপক্ষে এই বিচার করিতে সক্ষম। তত্ত্বের প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা হৃদয়ে যে অটল প্রতীতি জন্মে তাহাই প্রকৃত অভ্রান্ত জ্ঞান। এই যে প্রত্যক্ষদর্শনজনিত অনুভূতি তাহাকে ইংরেজীতে Intuition বলা যায়। এইরূপ জ্ঞানের তুলনায় যুক্তিমূলক অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্দ্ধ সত্য ও অর্দ্ধ অসত্য বা সত্যাভাস মাত্র। এমতাবস্থার আমাদের ন্যায় স্থূল-দর্শিগণের সত্য-নিরূপণের একমাত্র উপায় পূর্ব্বগত সাধক মহাত্মগণের লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের পরীক্ষা করা।

আমার আলোচ্য মূল বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সেই প্রেমিক-চূড়ামণির বংশীধ্বনির কথা বলিতে ছিলাম। ইহা সহজ বাঁশি নহে। এই 'বিষম বাঁশি' চণ্ডী-দাসের নায়িকার কাণে দংশন করিয়াছিল, তাই তাঁহার মুখে ইহার বিবরণ শুনুন। সখীকে বলিতেছেন—

শ্যামের বাঁশিটি, দুপুরে ডাকাতি,
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়ানি,
কেন বা এমতি কৈল॥
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে,
বধির করিল বাঁশি।
সব পরিহরি, করিল বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী॥

কুলের করম, ধৈরজ ধরম,
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে এই সে কারণে,
কাম্বর সববস বাঁশি॥

আর এই বাঁশিই—

কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে শঙ্কটে॥
হাঁরে সই শুনি যবে বাঁশির নিশান
গৃহকাজ ভুলি, প্রাণ করে আনচান॥
সতী ভুলে নিজপতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ।

উপরে দেখিয়াছি এই বাঁশির দংশনে আমাদের কবি 'বাঁধা ঘরে' 'বিষয়বোঝা' ফেলিয়া সেই বংশী-বদনের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এই বাঁশিই প্রেমময়ের প্রেমলীলার একমাত্র অস্ত্র—'কাম্বর সরবস বাঁশি'। ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচিত্র সুর পূরা রহিয়াছে, তাই এই বিশ্ব-কুঞ্জে নিশিদিন কত ভাবে কত রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছে—কখন বজ্র নির্ঘোষে, কখন কোকিলের কুহু-তানে, কখন দারুণ দুঃখের আঘাত-রবে, কখন সুখের মোহনস্বরে, কখন গুরু গম্ভীর জলধিগর্জ্জনে, কখন কল্লোলিনীর তরল কলস্বনে। এই রাগিণী বৈচিত্র্য দ্বারা প্রেমময় হরি বিচিত্র ভাবে বিশ্বজনের মোহসুপ্ত চিত্ত জাগাইয়া তুলিয়া প্রেমের খেলা খেলিতেছেন।

বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন
গগন অন্ধকার;
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝঙ্কার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাইনে দেখা তাঁর।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া

প্রাণ উঠিল পূরে,
জানিনে কোন্ বিপুল বাণী
বাজে বিপুল সুরে।
কোন্ বেদনায় বুঝি না রে
হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে
আপন কণ্ঠহার।

পাঠক, বিচার করিয়া দেখুন ইহা কি শুধু কবি-কল্পনা, না আধ্যাত্মিক জীবনের একটা সত্যকার অভিজ্ঞতা। এরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় ভক্ত জীবনে ত সচরাচর পাওয়া যায়।

সেই দারুণ বংশীধ্বনিতে প্রজ্জ্বলিতবিরহ প্রেমিক-কবির বিরহবৈচিত্র্যের দু' একটা নমুনা দেখাই।

যখন—

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,
গেলরে দিন বয়ে।
বাঁধন-হারা বৃষ্টি ধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে;

তখন—

একলা বসে ঘরের কোণে
কি ভাবি যে আপন মনে,
সজল হাওয়া যুথীর বনে
কি কথা যায় কয়ে!

তাই— হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে,
খুঁজে না পাই কূল,
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে
ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি
কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন ভুলে আজ সকল ভুলি,
আছি আকুল হয়ে!

আষাঢ়ের প্রকৃতির প্রভাব-সঞ্জাত এই অনির্দ্দিষ্ট উদাস আকুলতা এখন আরও সুস্পষ্ট হইয়া বিরহের তীব্র বেদনা পরিণত হইয়াছে—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।
তুমি যদি না দেখা দাও
কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

আবার প্রশ্ন—

এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।
জানিনা কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথ পানে ;
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

উত্তরে—

বেদনা-দূতী গাহিছে—"ওরে প্রাণ
তোর লাগি জাগেন ভগবান্!
নিশীথে ঘন অন্ধকারে

ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোর লাগি জাগেন ভগবান্।

এই আশ্বাসেই ঐ বেদনাকে কবি সহচররূপে বরণ করিয়াছেন যাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। এবং এজন্যই নিবিড়তব তিমির ঘন পথে অভিসারে বাহির হইতে আলোর সন্ধান করিতেছেন—

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালরে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবেনা যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষ-ঘন কালো।
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।

তার পরে—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসা
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার!
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার,
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার!

প্রেমের পথে অনেক কণ্টক আছে, তন্মধ্যে আত্মাভিমান একটা প্রধান কণ্টক। 'আমিত্বের' কণ্টকটাকে সমূলে উৎপাটিত না করা পর্য্যন্ত প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রকৃত স্থায়ী মিলনানন্দ লাভ

করা অসম্ভব। তাই, এই অভিমান ও প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্বজনিত তীব্র দহনে পুড়িয়া প্রেমপথের পথিককে মরিতে হয়, যে পর্য্যন্ত সেই প্রেমময় ভগবানের কৃপাকটাক্ষে তার ঐ অভিমান দূর হইয়া না যায় এবং তিনি জীবন যৌবন, কুলমান, সরম ভরম তাঁর চরণে সঁপিয়া না দিতে পারেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতি কবিদের কাব্যে বর্ণিত 'মান' ও 'মানভঞ্জনাদির' অর্থ. ত আমি ইহাই বুঝি। আমাদের কবির প্রেমাভিসারে ও ঐরূপ বিঘ্ন দেখা দিয়াছে—

একলা আমি বাহির হলেম
তোমার অভিসারে,
সাথে সাথে কে চলে মোর
নীরব অন্ধকারে।
ছাড়াতে চাই অনেক করে
ঘুরে চলি, যাই যে সরে,
মনে করি আপদ গেছে,—
আবার দেখি তারে।
ধরণী সে কাঁপিয়ে চলে,
বিষম চঞ্চলতা।
সকল কথার মধ্যে সে চায়
কইতে আপন কথা।
সে যে আমার আমি প্রভু,
লজ্জা তাহার নাই যে কভু
তারে নিয়ে কোন্ লাজে বা
যাব তোমার দ্বারে!

এই 'আমি'টাকে না ভুলিতে পারায়ই জয়দেবের রাধার ঈর্ষ্যা ও অভিমান বশে হরি-সঙ্গ ত্যাগ—

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।*

---

* শ্রীকৃষ্ণ অপরাপর গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে সমভাবে বিহার করিতেছেন দেখিয়া রাধিকা নিজোৎকর্ষ লোপাশঙ্কায় ঈর্ষাবশে অন্যত্র গমন করিলেন।

আবার সেই অলজ্জ্য প্রেমের আকর্ষণ ও ছাড়াইতে না পারিয়া—

কচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীং॥ *
—গীতগোবিন্দ ২।১

কিন্তু আমাদের কবি নিজের দীনতা কিরূপ অবগত আছেন এবং তাহা দূর করিবার জন্য কিরূপ প্রাণান্ত প্রয়াস করিতেছেন, তাহা দূর করিয়া দিবার জন্য সেই দীনবৎসলের নিকট কিরূপ আকুল প্রার্থনা করিতেছেন তাহা পূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে। আজ তাই প্রেমের আবদারে বলিতেছেন—

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চল্‌বে না।
এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বস,
কেউ জানবে না কেউ বল্‌বে না।
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি,
দেশ বিদেশে কতই ঘুরি,
এবার বল আমার মনের কোণে
দেবে ধরা, ছল্‌বে না!
জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,
সখা, তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গল্‌বে না?
না হয় আমার নাই সাধনা,
ঝরলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল
চকিতে ফল ফল্‌বে না?
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চল্‌বে না।

---

* মধুকর মণ্ডলীর গুঞ্জন মুখরিত কোনও লতাকুঞ্জে (প্রবেশ করিয়া, বিরহভারে) বিলীনা রাধা দীনভাবে নির্জ্জনে সখীর নিকট (মনোভাব) বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু সেই মুনির আরাধ্যধন যোগীর যোগেশ্বর, সুদুর্ল্লভ লীলা-ময় হরি কি আর চাওয়া মাত্র আসিয়া ধরা দেন, 'হৃদয়মাঝে লুকিয়ে' বসেন! তিনি বহুকাল আমাদিগকে দেশ বিদেশে ঘুরাইয়া লুকোচুরি খেলাইয়া, পোড়াইয়া জ্বালাইয়া জাগাইয়া নির্ম্মল করিয়া তবে তাঁর অমৃতের কণা দানে শীতল করেন। কবির সুপ্তিমগ্ন হৃদয়ের সহিত ঐরূপ লুকোচুরি দেখুন—

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি।
কিঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী!
এসেছিল নীরব রাতে,
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।
তাই—জেগে দেখি দখিন হাওয়া
পাগল করিয়া,
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া।

তাই দুঃখ—

কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগেনি।
তাই—হৃদয় মোর চোখের জলে
বাহির হল তিমির তলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে
বাড়ায়ে দুই হাত
ফিরোনা তুমি ফিরোনা, কর
করুণ আঁখি পাত।

যে বিরহে চণ্ডীদাসের রাধার বিলাপ—

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল"

আর—

এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে পরিহরি,
ছেদন করিয়া দেও পিরীতির ডুরি,"

যে বিরহে জয়দেবের রাধার—

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোহপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালা কলাপায়তে।

[(রাধার পক্ষে ; গৃহ অরণ্য হইয়াছে এবং তাঁর প্রিয়সখী গণকে বন্ধন রজ্জ্যবৎ মনে করিতেছেন। ঘন দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার শরীর সন্তাপ দাব দহন জ্বালার ন্যায় বোধ হইতেছে ;]

সেই বিরহ দহনে আমাদের কবির সহিষ্ণুতা এবং প্রেমের অটলতা ও নির্ভীকতা দেখুন—

এই করেছ ভালো, নিঠুর
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয়না কিছুই আলো।

কবির প্রেমের এই অটলতা ও ধৈর্য্যের মূল সেই প্রেমময়ের তার প্রতি প্রীতিতে বিশ্বাস। কারণ, স্বয়ং ভগবান্ইত জয়-দেবের অমর লেখনী-মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব জলধিরত্নং। *

* তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার এ ভবজলধির রত্ন স্বরূপ।

তাই আমাদের কবির প্রেমের গর্ব্ব—

আমার মিলন লাগি তুমি
আসচ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।

কারণ,— দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোট হয়ে
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।

এই অপার দয়ার মাহাত্ম্য হেতু সেই পরিপূর্ণ পরমেশ্বর (যাঁহাকে শ্রুতি—'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মদচ্যতে * বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন)

"প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানং।
+ * *
--মম শিরসি মণ্ডনং
+ দেহি পদ পল্লব মুদারং" বলিয়া রাধার মান

ভঞ্জন করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত বিশ্বাসের অটলতা ও ঐকান্তিকতা বশতই দেখিতে পাই, যে অবস্থায় চণ্ডীদাসাদির নায়িকা গরল ভখিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার বাসনা করিয়াছেন সে অবস্থায় আমাদের কবি ঐ আগুন হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া ঐ আকাশের তারকার ন্যায় অচঞ্চল ধৈর্য্যে প্রতীক্ষা করিয়া হৃদয়ের প্রেমের আবেগ প্রকাশ করিতেছেন—

এস হে এস সজল ঘন
বাদল বরিষণে;
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ জীবনে।

---

* তিনি পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ, সম্পূর্ণ।

+ প্রিয়ে, চারুশীলে, আমার প্রতি অকারণ মান ত্যাগ কর। তোমার পরম রমণীয় পদ পল্লব আমার শিরে স্থাপনকর, তাহা আমার মস্তকের ভূষণ হউক।

এস হে এস হৃদয়ভরা,
এস হে এস পিপাসাহরা,
এস হে আঁখি-শীতল-করা
ঘনায়ে এস মনে।

কারণ, বহুবর্ষ পূর্ব্বেই ভানুসিংহ ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণ সেঁ
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি।

এখন ঐ বিরহ তীব্রতম হয়ে বিশ্বময় যেন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাই নিজের বিরহে যেন প্রেমাস্পদের বিরহ ও আনিয়া যুক্ত হইয়া একাকার হইয়াছে—

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে, শ্রাবণ ধারায়,
তোমারি বিরহ বাজে হে।
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,
কত প্রেমে হায় কত বাসনায়
কত সুখে দুঃখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠেছে ভরিয়া
আমার বিরহ মাঝে হে।

ইহার ফল তন্ময়তা, এবং চরাচরে প্রেমাস্পদের রূপের স্বপ্ন-দর্শন। এ অবস্থা প্রকৃত মিলনেরই পূর্ব্বাভাস—ইহাতে দৃষ্টতঃ বিচ্ছেদ মিলনের পার্থক্য বড় একটা থাকেনা এবং বিরহ মধুর-

হইয়া উঠে। "গীতাঞ্জলিতে" এই জাতীয় বহু কবিতা আছে। কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি পাঠককে উপহার দিব বুঝিতে পারিতেছি না।

"এসেছি তোমারে, হে নাথ,
পরাতে রাখী।
প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখোনা ঢাকি।
তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে
ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেক তারে ঘুচাতে চাই
তোমারে ডাকি"

বলিয়া কবি যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন তাহা যেন তার নাথের কাণে পঁহুছিয়াছে। তাই—

(১)

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
ভরা বাদরে,
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে।

* * *

আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে!

* * *

অন্তরে আজ কি কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌ল আগল,
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে!
আজি এমন করে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে!

(২)

তোরা শুনিস্‌ নি তার পায়ের ধ্বনি,

ঐ যে আসে, আসে, আসে!
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।

* * *

কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে আসে।
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
দুখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে
সুখে কখন্ বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি!
সে যে আসে, আসে, আসে।

(৩)

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলি তলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।
আলোছায়ার আঁচল খান
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুল গুলি ঐ মুখে চেয়ে
কি কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেল ঠেলে;
নয়ন-ভুলানো এলে।

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশ-বীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে।

(৪)

এই যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।
এই যে মধুর আলস ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে
এই যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।
এই ত তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়-হরণ।

*　　*　　*

এই তোমারি প্রেমের বাণী
প্রাণে এসেছে;
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে,
মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
তোমারি চরণ।

(৫)

দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও,
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও ;

পাশে থেকে চিনতে নারি,
কোন্ দিকে যে কি নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্‌বিহারী
হৃদয় পানে হাসিয়া চাও।
বল আমায় বল কথা
গায়ে আমার পরশ কর।
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে
আমায় তুমি তুলে ধর।

পাঠক, এখানে একটু থামিয়া উদ্ধৃত কবিতাগুলির রস আস্বাদন করি। আমি ত এই কবিতাংশটির রসমাধুর্য্যে বিভোর হইয়াছি। যে তরুণী নব বধূ বিবাহ রজনীতে লজ্জাজড়িত নত দৃষ্টিতে একবার মাত্র চকিতে তার বরটিকে দেখিয়া লইয়াছিলেন তিনি আজ যেন নব যৌবনের পূর্ণ সুষমায় প্রস্ফুটিত হইয়া, হৃদয়ে নির্জ্জনসঞ্চিত অতৃপ্ত প্রীতির অর্ঘ্য বহন করিয়া, "তনু মন ধন" নিবেদন করিয়া দিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য তার হৃদয় বল্লভের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহার অস্পষ্ট মুখ-চ্ছবি এত দিন হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছিল অথচ যিনি অচেনা অজানা ছিলেন, তাঁহার সামীপ্য লাভের ও তাঁহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আকস্মিকতায় প্রেমের আদান প্রদান করিতে হৃদয়ে স্বভাবতই দারুণ ভীতির সঞ্চার হইতেছে। অথচ এ দিকে অতৃপ্ত প্রেমের তীব্র তাড়নায়, দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনের বন্ধনে অঙ্গে অঙ্গকে মিলাইয়া মিশাইয়া হৃদয়-দেবতার সঙ্গে একাঙ্গ হইবার বাসনায় প্রাণ আকুল ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। অন্য দিকে তার লীলাচতুর হৃদ্‌বিহারী সকৌতুকে মুখ বাঁকাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া যেন ঐ মধুর দৃশ্য উপভোগ করিতেছেন। তাই এই নিরুপায় অবস্থায় সেই ভীতা প্রেমচঞ্চলা প্রেমিকা সরম ভরম দূর করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন—হে জীবনসর্ব্বস্ব, তোমার যে সঙ্গ আমার চিরবাঞ্ছিত তাহাই আজ আমাকে ভীতি-বিহ্বল করিতেছে—আমি যেন ভয়ে দৃষ্টিহীনা, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িয়াছি। হে প্রভো, তুমি দয়া করিয়া আমার দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে চাও মধুর হাস্যে আমার অবশ হৃদয়ে আশ্বাস দিয়া

আমাকে রক্ষা কর, ওই প্রেমের বাণী শুনাইয়া, অঙ্গে তোমার অমৃত পরশ দান করিয়া, দুই হাতে আমাকে বুকে ধরিয়া আমার সকল পিপাসা মিটাও।

বস্তুতঃ সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধার পূর্ণ ব্রহ্ম, যাঁহার স্বরূপের কাছে মানুষের বাক্যমন ঘেঁষিতে পারেনা বলিয়া শ্রুতি বারবার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি দয়া করে স্বকীয় ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তির অত্যুগ্র জ্যোতিঃ সম্বরণ করিয়া "আঁখি-শীতল-করা" সুস্নিগ্ধ প্রেমের মূর্ত্তি ধারণ না করিলে মানুষের কি গতি হয় তাহা বীরকুল-কেশরী অর্জ্জুনের ঘোর বিশ্বরূপদর্শনে ভীতি ও ব্যথা বিহ্বল মূঢ়ভাবাপন্নাবস্থা (যাহা ভগবদগীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে) দেখিয়া পাঠক বুঝিতে পারেন। আধ্যাত্মিক জীবনের এই তত্ত্বই ঐ কবিতা ছলে কবির হৃদয়ের ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে।

অতঃপর পাঠক লক্ষ্য করিলে দেখিবেন যে পাঁচটি কবিতা উপরে একাদিক্রমে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে কবির প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যানুভূতির ক্রমাভিব্যক্তিটি প্রতিফলিত হইয়াছে—একটির পর আর একটি কবিতা যখন পাঠ করি তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সুস্পষ্ট অনুভব করি যে কবি ক্রমে ক্রমেই তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিতের নিকট হইতে নিকটে পঁহুছিতেছেন। আর, ঐ কবিতাগুলিতে যে মিলন দৃশ্য দেখিতে পাই তাহা প্রকৃত জাগ্রন্মিলনের চিত্র, কি তীব্র বিরহ সাঞ্জাত মিলনের স্বপ্ন, তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিনা। তবে প্রেমের অবস্থা বিশেষে যে ঐরূপ স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে তাহা জানি। তাই—

শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥ *

—চণ্ডীদাস

---

* Cf বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতং।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতং॥

(রাধা) নির্জ্জনে মৃগমদ দ্বারা তোমার কন্দর্প সদৃশ মূর্ত্তি চিত্রিত করিতেছেন—পাদমূলে মকর এবং কর-পদ্মে নবাম্রমুকুল-

আর ঐ অবস্থায় প্রেমিকা নিজেই বুঝিতে পারেন না তিনি জাগ্রৎস্বপ্নে কি পূর্ণ জাগ্রদবস্থাপন্না। যথা—

গায়ে আমার পুলক লাগে,
চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখীর ডোর!
আজকে এই আকাশ-তলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে মনোহরণ
ছড়ালে মন মোর!
কেমন খেলা হ'ল আমার
আজি তোমার সনে!
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই
ভেবে না পাই মনে।
আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়ন জলে,
বিরহ আজ মধুর হয়ে
করেছে প্রাণ ভোর।

কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে এরূপ স্বপ্ন অনাগত সত্যের পূর্ব্বাভাস—এস্বপ্ন অচিরেই সত্যে পরিণত হয়। তাই দেখুন—

নিশার স্বপন ছুটলরে, এই
ছুটলরে!
টুটল বাঁধন টুটল রে!
রইলনা আর আড়াল প্রাণে,
বেরিয়ে এলেম জগৎ পানে,
হৃদয়-শতদলের সকল
দলগুলি এই ফুটলরে, এই
ফুটলরে।

রূপ বাণ অঙ্কিত করিয়া প্রণাম করিতেছেন।
—গীতগোবিন্দ ৪র্থ সর্গ।

দুয়ার আমার ভেঙে শেষে
দাঁড়ালে যেই আপনি এসে,
নয়ন-জলে ভেসে হৃদয়
চরণ-তলে লুটিলরে!

পাঠক, দেখুন "গীতাঞ্জলির" প্রথম কবিতার প্রার্থনা পূরণ হইয়াছে। তাই আজ—

আকাশ হ'তে প্রভাত-আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙাকারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠলরে, এই
উঠলরে!

তাই এখন সার্থকজীবন হইয়া প্রেমপুলকিত চিত্তে প্রেমময়ের জয় ঘোষণা করিয়া গাহিতেছেন—

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি,
বল ভাই ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্য পাটে,
ধন্য হরি শ্মশান ঘাটে,
ধন্য হরি ধন্য হরি।
সুধা দিয়ে মাতান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি,
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে
ধন্য হরি হাসি মুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে
ধন্য হরি ধন্য হরি।
আপনি কাছে আসেন হেসে
ধন্য হরি ধন্য হরি,
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে

ধন্য তার ধন্য তারি।
ধন্য হরি স্থলে জলে,
ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়-পদ্মদলে
চরণ-আলোয় ধন্য করি।

এই কবিতাটি চণ্ডীদাসের সেই মিলনানন্দবিহ্বলা রাধার উক্তিটি স্মরণ করাইয়া দেয়—

শ্যাম সুন্দর স্মরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন,
শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন,
শ্যাম-দাসী হলো রাধা॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥

পাঠক, বিচার করুন "গীতাঞ্জলীর প্রার্থনা" কি 'শুষ্ক প্রার্থনা,' ইহাতে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের কোন মায়িক সম্বন্ধের অভিব্যক্তি আছে কিনা — ইহা ভারতকে তৃপ্তি দান করিতে পারে কিনা। যদি আপনিও "সুরমা" পত্রের পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের সঙ্গে এক-মত হয়েন তবে বলিব আজ ভারতের হৃদয় ধুঁধুঁ মরুভূমে পরিণত হইয়া গেছে।

VII

এ প্রবন্ধে "গীতাঞ্জলি" সম্পর্কে দু একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথমতঃ এ গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বাণী কিরূপ অকুণ্ঠিত হস্তে তাঁর প্রিয় সেবকের নিকট ভাষা-বিভবের অনন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন এবং অনুগৃহীত সেবক কি কৌশলে ও সাগ্রহে এই ভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্নরাজি চয়ন করিয়া বঙ্গভাষা-লক্ষ্মীর সুকুমার অঙ্গ অতুল শোভায় মণ্ডিত করিয়াছেন তাহা "চিত্রা," "চিত্রাঙ্গদা," "বিদায় অভিশাপ" "উর্ব্বশী" প্রভৃতির পাঠক অবগত আছেন। ভাষার ঐশ্বর্য্যের প্রতি কবির আকর্ষণ "নৈবেদ্যের" সময় পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে দেখিতে পাই ভাষার গতি ফিরিয়াছে—কবির ভাষা তখন হইতে সংস্কৃত শব্দবাহুল্যের ও অলঙ্কারের বাহ্য আড়ম্বর বর্জ্জন করিয়া প্রচলিত সরল ছোট ছোট কথাকে আশ্রয় করিয়াছে। আর "গীতাঞ্জলি" ও তৎপরবর্ত্তী (মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত) কবিতা গুলিতে দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-লক্ষ্মী যেন কবির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব সম্ভোগবাসনা ও বাহ্য ভূষণের বিলাস-প্রসাধন উপেক্ষা করিয়া গৈরিক বস্ত্রের রিক্ত সুষমায় মণ্ডিত হইয়া যোগিনী সাজিয়াছেন। বাস্তবিক, যখন বলিবার বিষয় অল্প থাকে তখনই কবিগণ উপমা ও কল্পনা সাহায্যে কাল্পনিক বিচিত্র চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়া বক্তব্যটিকে পুষ্ট ও বিস্তারিত করতঃ মূল প্রসঙ্গ অপেক্ষা অবাস্তব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় দ্বারা পাঠকের মনকে মোহিত করেন। কিন্তু কবিদের হৃদয় পাত্র যতই ভাবের পীযূষ-রসে পূর্ণ হইতে থাকে ততই তাহা প্রকাশের ধ্বনি ও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে এবং অবশেষে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিলে বাক্য প্রায় নীরব হইয়া যায়। প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যেই ভাষার এই অনাড়ম্বর সরলতার দিকে ক্রমিক পরিণতি লক্ষ্য করা যায় বলিয়া আমার ধারণা। কবিদের শেষোক্ত অবস্থার কাব্যের অর্থভরা ছোট ছোট কথা গুলি আমাদের কাণের কাছে যতটা প্রকাশ করে হৃদয়ের কাছে তার সহস্র গুণ অধিক ব্যক্ত করে; কারণ, উহা যে কবির হৃদয়ের সহজ ভাষা এবং হৃদয়ের ভাষা না হইলে পরের হৃদয়ের কাণে কথা বলিতে পারেনা, মরমে পশিতে পারেনা। "গীতাঞ্জলির ভাষা এই জাতীয়। তাহা ভাবের বিচিত্র ঋজুগতির

অনুসরণ করিয়া, ভাবের মাধুর্য্যে বিভোর হইয়া মন্ত্রমুগ্ধা অনুগতার ন্যায় চলিয়াছে—অথচ এই ঋজুগতিতে কৃত্রিম কলাকৌশল বর্জ্জিত চেষ্টালেশবিহীন এমন একটা সহজ নৃত্য ও মৃদুমধুর ঝঙ্কার এবং এমন একটা উদার রাগিণী আছে যাহা রসজ্ঞ পাঠককে এক অপূর্ব্ব আনন্দে বিহ্বল করিয়া ফেলে। "গীতাঞ্জলির" ভাষা ও ছন্দের এই নয়োদার সৌন্দর্য্য পাঠক পূর্ব্বে উদ্ধৃত কবিতা গুলি হইতে অবশ্যই সম্ভোগ করিয়াছেন, তাই প্রবন্ধের দীর্ঘতাবিবেচনায় আর কোন কবিতা উদ্ধার করিবনা। শুধু তাঁর ভাষা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্য শুনুন—

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলঙ্কার;
তোমার কাছে রাখেনি আর
সাজের অহঙ্কার।
অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝঙ্কার।
তোমার কাছে খাটেনা মোর
কবির গরব করা,
মহাকবি, তোমার পায়ে
দিতে চাই যে ধরা।
জীবন লয়ে যতন করি
যদি সরল বাঁশি গড়ি,
আপন সুরে দিবে ভরি
সকল ছিদ্র তার।

"গীতাঞ্জলির" কবিতাগুলিতে যে অলঙ্কারাভাবের ছিদ্র আছে তাহা ঐ সুরে ভরিয়া উঠিয়াছে কি না পাঠক বিচার করুন। বস্তুতঃ গ্রন্থের ভাষার প্রসাদ গুণই তার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

অতঃপর "গীতাঞ্জলি" সম্বন্ধে আর একজন লেখকের দুএকটা মন্তব্যের আলোচনা করিব। উক্ত লেখক বিগত ডিসেম্বর মাসের

"Hindu Review" নামক মাসিক পত্রে 'রবীন্দ্র নাথ ও নোবেল পুরস্কার' শীর্ষক একটি ইংরেজি প্রবন্ধে কবিবরের য়ুরোপে এতটা সম্মান খ্যাতি লাভের ও উল্লিখিত পুরস্কার প্রাপ্তির কারণ আলোচনা করিতে গিয়া "গীতাঞ্জলি" সম্বন্ধে ও তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ হইতে "গীতাঞ্জলি" সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য গুলির ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। লেখকের মতে:—

রবীন্দ্র নাথের স্তুতিবাদকারিগণের মধ্যে ও এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প যাহারা "গীতাঞ্জলিকে" কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য সমূহের সমস্থানীয় মনে করেন। তাঁহার মতে এরূপ লোক কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। 'উর্ব্বশী,' 'চিত্রাঙ্গদা,' 'পতিতা,' 'সোনার তরী' এবং "নারী" শীর্ষক গীতিকবিতাবলীই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান। তদ্ভিন্ন উক্ত সংগ্রহের মধ্যে আরও অনেকানেক কবিতা ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে যাহার বলে কবি আধুনিক ভারতীয় অথবা য়ুরোপীয় কবিমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম পংক্তিতে আসন পাইবার দাবী করিতে পারেন। কিন্তু "গীতাঞ্জলি" ঐ সকলের কোনটিরই কাছে ঘেষিতে পারেনা। ঐ গ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবি শুধু তাঁর সহজবুদ্ধিজাত আধ্যাত্মিক স্বানুভূতি গুলিই অবিরাম প্রকাশ করিয়াছেন এবং এজন্যই এসকল কবিতায় সেই অন্তর্দ্দৃষ্টির সুস্পষ্টতা নাই, সেই অটল আধ্যাত্মিক-তত্ত্বাববোধ নাই যাহার পরিচয় বঙ্গীয় পাঠকেরা তাহাদের প্রাচীন কবিদের কাব্যে পাইয়াছেন। বঙ্গের ধর্ম্মবিষয়ক কাব্য-সাহিত্যে মানবীয় ও দৈবভাবের অসঙ্কোচ মেশামেশি রহিয়াছে। তাই এই সাহিত্যে যেমন আধ্যাত্মিকতা আছে সেরূপ বাস্তবতা (বস্তু-তন্ত্রতা?) আছে, যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব সেইরূপ স্পষ্ট যথার্থ মানবীয় ভাব আছে। এ কথা যেমন বৈষ্ণব কবিদের তেমন শাক্ত কবিদের সম্বন্ধে খাটে। বৈষ্ণব সাধনায় এবং শাক্ত সাধনায়, উভয়ত্র এই গভীরতম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা গুলিকে বাস্তব (ব্রাহ্মিক) আকারে গড়িয়া প্রকাশ করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্র নাথের (ধর্ম্ম সঙ্গীতের) আধ্যাত্মিকতায় বাহ্যবস্তু-সম্পর্কহীনতায়, নির্ব্বি-

শ্লেষতার, তার অতি সূক্ষ্ম-অবাস্তবতার দরুনই তাহা বাঙ্গালীর হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, "গীতাঞ্জলির" মানস-কল্পনা,—যাহা অর্দ্ধ-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও অর্দ্ধ-অতীন্দ্রিয়, যাহাতে মানবীয়ত্ব আছে অথচ ইন্দ্রিয়-পরতা নাই, আধ্যাত্মিকতা আছে অথচ অস্বাভাবিকতা (স্বভাবের সঙ্গে বিরোধ) নাই, এবং যাহা স্বকীয় জটিলতাবিহীন ঋজুতা ও অসংলগ্নতাহেতুই বাস্তব মানবীয় ভাবে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে,—সেই মানস-কল্পনা য়ুরোপীয় সমাজের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। যেহেতু ঐ য়ুরোপীয় সমাজ এখনও ইন্দ্রিয়াতীতের ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অন্বেষণে অন্ধকারে হাতড়াইতেছেন।" *

প্রথমতঃ লেখক বলিতেছেন—"গীতাঞ্জলি" আধ্যাত্মিক বিষয়ে কবির স্বানুভূতির বাহ্য প্রকাশ মাত্র (out-pourings of his religious intuitions), তাহাতে অন্তর্দৃষ্টির ও তত্ত্বাববোধের অভাব। এস্থলে কিন্তু আমরা লেখকের যুক্তি-প্রমাণ-বিহীন সিদ্ধান্ত মাত্র পাইতেছি, এ সিদ্ধান্ত কি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা ইহার পোষকতায় কোনও প্রমাণ আছে কিনা তাহা আমরা জানিনা। আধ্যাত্মিক বিষয়ক সাহিত্যালোচনায় লেখকের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপভাবে এত বড় গুরুতর একটা মন্তব্য আজিকার যুক্তিবাদের দিনে পাঠকের মধ্যে চালাইয়া দেওয়ার প্রয়াস যেমন বিস্ময়কর তেমনি অসমসাহসিকের কার্য্য। গুরুর আদেশের ন্যায় তাহা যদি শিক্ষিত বঙ্গবাসী শিরোধার্য্য না করেন তবে লেখক আশা করি মনক্ষুণ্ণ হইবেন না। যাহা রবীন্দ্র নাথের স্বানুভূতি মাত্র অতএব বাঙ্গালী পাঠকের পাঠের অযোগ্য বিবেচনায় লেখক প্রচার করিয়াছেন তাহা কোন্ কোন্ স্থলে এবং কিরূপে আপ্তবাক্যের ও প্রাচীন তত্ত্বদর্শীদের লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের বিরোধী, ইহা লেখক অনুসন্ধান করিয়া

* The Hindu Review (December number 1913) p.p. 422—23. মূল প্রবন্ধাংশ দ্রষ্টব্য।

দেখিয়াছেন কি ? আমি রবীন্দ্রনাথকে ঋষি ও তাঁহার কবিত্বকে ঋষিত্ব বলিয়া মনে করি না। বরঞ্চ যদি কেহ এরূপ মত পোষণ করেন তবে তিনি শুধু হাস্যাস্পদ নহেন, কৃপার পাত্র বটেন। আর, এরূপদাবী করিবার বাসনামাত্র ও যে ক্ষণেকের জন্য স্বয়ং কবির মনে জাগেনাই তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ তাঁর কাব্যের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। তাঁহার "নৈবেদ্য" "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতি কাব্যে আমরা কবিকে "দীনহীন" ভক্তরূপে, প্রেমময় হরির জন্য ব্যাকুলহৃদয় প্রেমিক বৈরাগী রূপেই দেখিতে পাই। কিন্তু আমি ভারতীয় ধর্ম্মসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এবং ধর্ম্মসঙ্গীতের মর্ম্ম যতটা বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে ধারণা হইয়াছে কবি প্রাচীন ঋষিদের ও প্রাচীন বৈষ্ণবকবিদের শিক্ষার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন এবং জীবনে ঐ শিক্ষাই ফলাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন; ঐ শিক্ষার মর্ম্মই তিনি নিজের হৃদয়ের জীবন্ত ভাষায়, তমোমুগ্ধ কর্ম্ম-বিহীন স্বদেশ-বাসীর ও সত্বসংস্রবহীনরাজসিক-কর্ম্ম-বাহুল্যের অশ্রান্ত আন্দোলন-ক্লিষ্ট পাশ্চাত্যদের হিতের জন্য, প্রকাশ করিতেছেন। তাই দেখিতে পাই কবি তাঁর "নৈবেদ্যে" যেমন স্বদেশকে জাগরিত করিবার জন্য তীব্র ভৎসনা করিয়াছেন তেমনি অসঙ্কোচে তীব্র ভাষা প্রয়োগে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যাবরণ দূর করিয়া দিয়া তার প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়াছেন। এজন্যই পূর্ব্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি-শিষ্য' বলিয়াছি এবং লোকহিতের দিক হইতে বিচার করিয়া তাঁহাকে আধুনিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনা করিয়াছি। বস্তুতঃ রবিবাবুর ধর্ম্মবিষয়ক কাব্যে ও সঙ্গীতে এমন একটি বাক্য পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ যাহার পোষকতায় ভারতীয় ঋষিদের বা প্রাচীন সাধকদের কোন না কোন সমর্থক উক্তি উদ্ধৃত করা না যায়।

প্রাচীন বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিদের কাব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত লেখক বলিয়াছেন—

"The human and the divine boldly intermingle with one another in the religious poetry of Bengal. They are as intensely real as they are spiritual, as

solidly human as they are divine." *

আর উক্ত কাব্যাদির সঙ্গে "গীতাঞ্জলির" পার্থক্য প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—

"The half-Sensuous and half-Supersensuous fancies of the "Geetanjali," which are human without being carnal, and spiritual without being unnatural, which by their very Simplicity and incoherence lend themselves equally to realistic and human as to spiritualistic & divine interpretations, have appealed with great force to peoples groping after the unseen and the spiritual." *

প্রথমে লেখকের শেষোদ্ধৃত উক্তির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। 'half-sensuous' এবং 'half-Supersensuous, এ দুটি শব্দদ্বারা লেখক ঠিক কি বুঝাইতে চাহেন তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা একাদশেন্দ্রিয়ের একটি না একটি দ্বারা সম্পূর্ণ সুস্পষ্টরূপেই গ্রহণ করা যাইবে, ইহার অন্যথা ত কল্পনা করিতে পারিনা। তবে যদি কাহারও উক্ত ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে কোনটির অভাব বা তাহা অপুষ্ট থাকে তবে তাহার কথা স্বতন্ত্র; কারণ, তাহার নিকট সকল পদার্থই অর্দ্ধইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া প্রকাশ পাইবে। আর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়ের মধ্যপথে একটা অর্দ্ধ-অতীন্দ্রিয়াবস্থা সম্ভবপর কিনা তাহাও জানি না। আমিত এরূপ ও কিছু ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই পাঠক যদি আমার সঙ্গে একমত হন তবে উক্ত শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটির প্রথমার্দ্ধ 'half' (অর্দ্ধ) কথাটি উক্ত বাক্যের অর্থহীনতা দূর করিবার অনুরোধে উঠাইয়া দিন, নতু বাক্যটি বাক্যাড়ম্বর মাত্র হইয়া পড়ে। এরূপ ভাবে সংশোধিত হইলে উক্ত শব্দদ্বয় প্রথমোদ্ধৃত ইংরেজী প্রবন্ধাংশের the human and the

* ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণের সুবিধার জন্ত মূল প্রবন্ধের এই সকল ও অন্যান্য আলোচ্য অংশের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

divine এর সমানার্থবাচক হইয়া পড়ে।

এখন 'incoherence' শব্দটার প্রয়োগ সুষ্ঠু হইয়াছে কি না দ্রষ্টব্য। এই কথাটার অব্যবহিত পূর্ব্বেই লেখক স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন যে "গীতাঞ্জলির" 'ফ্যান্সিতে' (কল্পনায়) মানবীয়ত্ব আছে কিন্তু কামের, ইন্দ্রিয়পরায়ণতার গন্ধলেশ নাই, "গীতাঞ্জলির," ভাবুকতায় আধ্যাত্মিকতা আছে কিন্তু স্বভাব-বিরুদ্ধতা নাই। "গীতাঞ্জলির" আধ্যাত্মিকতা যদি অস্বাভাবিক হইত, তাহার মানবীয়ত্বে যদি ইন্দ্রিয়পরতা থাকিত তবে বুঝিতে পারিতাম যে তাহা বিরুদ্ধ অসংলগ্ন ভাবসমষ্টির খাপছাড়া কৃত্রিম সংমিশ্রণ। ঐ সকল গুণের কথা স্বীকার করিয়া পরে লেখক বলিতেছেন—

Which by their very simplicity and incoherence lend themselves equally to realistic & human as to spiritulistic & divine interpretations etc.

এস্থলে simplicity (সরলতা) কথাটার সঙ্গে incoherence কথাটা cohere করে কি—এই দুইটি শব্দ সুসম্বদ্ধ হয় কি? জটিল ভাবসমূহকে জটিল ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলেই দেখা যায় তাদের পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গতি আসিয়া পড়ে এবং সমস্ত বক্তব্যটি খাপছাড়া বিরুদ্ধভাব সূচক শব্দ সমষ্টি হইয়া পড়ে। কিন্তু যেখানে ভাব ও ভাষা উভয়ই সরল, ভাষাটি প্রসাদ গুণ সমন্বিত * সেখানে incoherence (অসংলগ্নতা) দোষ ঘটিবার অবসর কোথায়? তার পর লেখক বলিতেছেন যে উক্ত অসংলগ্নতা দোষের দরুনই গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিকে প্রকৃত মানবীয় ভাবে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। পাঠকের বোধ করি স্মরণ আছে বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিদের কাব্যের এই দুই ভাবেই ব্যাখ্যা হইতে পারে বলিয়া লেখক পূর্ব্বে ঐ কাব্যের প্রশংসা করিয়াছেন। তাই simplicityর সঙ্গে incoherence না থাকিলে যে ঐরূপ দুই রকম ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে একথা লেখকের অভিপ্রেত বলিয়া বলিতে পারা

* "গীতাঞ্জলি" হইতে যে বহুসংখ্যক কবিতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে এ কাব্যের উক্ত গুণের ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাঠক পাইয়াছেন।

যায় না। কাজেই ইহা নিশ্চিত যে coherence শব্দের স্থলে লেখক হয় স্বেচ্ছায় জোর করিয়া তদ্বিপরীত অর্থজ্ঞাপক in-coherence শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছেন, নয় মুদ্রাকরের বা লেখকের অনবধানতা বশতঃ 'in' এই অভাবাত্মক উপসর্গটি coherence শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হইয়া এই অনর্থজনক উপসর্গের সৃজন করিয়াছে।

"গীতাঞ্জলির" যে 'fancies' এর কথা লেখক উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে প্রকৃত 'Spiritual realities' (আধ্যাত্মিক তত্ত্ব), কিন্তু ভুয়া মানস-কল্পনা নহে তাহা ইতিপূর্ব্বে (৬৯-৭২, ৯৪ ও ৯৫পৃঃ) বলিয়াছি। এখন আমার উল্লিখিত প্রণালীতে "গীতাঞ্জলি" সম্বন্ধে উক্ত লেখকের উক্তিটি সংশোধিত হইলে তাহা এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়—

The human and the Spiritual realities of the *Geetanjali*, which are human without being carnal and spiritual without being unnatural, which by their very simplicity and coherence lend themselves equally to realistic & human as to spiritual istic and divine interpretations etc. etc.

পাঠক, উপরোক্ত কথা গুলির সঙ্গে এখন একবার প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদের সম্বন্ধে লেখকের যে উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা মিলাইয়া দেখুন ইহাদের মধ্যে কোনরূপ ভাবগত প্রভেদই নাই। স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য কৌশলী আইনব্যবসায়ী যেখানে কোন বিভিন্নতা নাই সেখানেও বৈষম্যের আবিষ্কার করেন। উক্ত লেখক ও দেখিতেছি ঠিক অনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। এরূপ করিবার কারণ খুঁজিবার জন্য বহুদূর যাইতে হইবে না— তাঁহার প্রবন্ধের যে অংশের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বে দিয়াছি তাহাতেই তাহার স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—

(1) Both Vaishnavism * * and Shakti-ism * * lend themselves to the creation of realistic representations of the deepest spiritual experiences etc.

(2) But the very abstractions of Rabindranath's religious pieces, their very impalpableness, so to say,

which failed to touch the deeper chords of the heart of the Bengalee people etc. etc.

উদ্ধৃত বাক্যাংশ দুটি হইতে পাঠক স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন লেখকের চক্ষে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম সঙ্গীত,ও কবিতার ত্রুটি কোথায়। তাঁহার মতে, যেহেতু কবির উক্ত কবিতাদি মানুষের হাতেগড়া মূর্ত্তি সাহায্যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার পোষকতা করেনা (do not "lend themselves to the creation of realistic representations."), অতএব তাহা 'fancies,' 'abstractions,' 'impalpable' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বাস্তবতা বিহীন, এবং তজ্জন্য বাঙ্গালীর হৃদয় স্পর্শ করিতে অসমর্থ। যাঁহারা হাতেগড়া মূর্ত্ত্যাদির সাহায্যে উপাসনা করেন তাঁহাদের প্রতি এ দীন লেখকের ও শ্রদ্ধার অভাব নাই। কারণ, ধ্যান ধারণার ও মনের একাগ্রতার জন্য যাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ বাহ্যিক উপকরণাদির সাহায্যের আবশ্যকতা আছে তাহাদের পক্ষে ইহা বর্জ্জন করাই অনিষ্টকর। কিন্তু এই জাতীয় বাহ্যিক সহায়তা স্বল্পাধিকারীর পক্ষে অত্যাবশ্যক হইলেও যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষ জন্মান্তরের পুণ্যফলে অসামান্য মনীষা-সম্পন্ন তাঁহাদের পক্ষে ও ঐরূপ ব্যবস্থা অবর্জ্জনীয় মনে করা অন্যায়। বস্তুতঃ, যখন ভারতবর্ষ আত্মিকজগতের গুরুস্থানীয় ছিল, যখন ভারতের প্রাচীন তপোবনের শান্ত নিস্তব্ধতা আন্দোলিত করিয়া—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্,
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি,
নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" * এই সঞ্জীবনী

* ——"শোন বিশ্বজন,
"শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি!"

উদাত্তবাণী উত্থিত হইয়াছিল, ভারতের সেই মহিমোজ্জ্বল গৌরব-মধ্যাহ্নে ধর্ম্ম-সাধনের জন্য সাধকের পক্ষে সর্ব্বব্যাপী অনন্ত ভগবানের কোনরূপ কৃত্রিম খণ্ডিত মূর্ত্তি বা কল্পিত চিত্রাদিরই আবশ্যকতা ছিলনা। কারণ, তখন ভারতের চিৎ-শক্তি ভূধরের ন্যায় অটল উন্নত ছিল, তাহাঁর চিত্তের অনন্ত বিশালতা ছিল, তাই তখনকার ভারত "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই মহা বাক্য স্মৃতিপটে আঁকিয়া এই বিরাট্ বিশ্ব প্রকৃতিতে সেই বিরাট্ বিশ্বেশ্বরের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইত। পরবর্ত্তী কালে ও দার্শনিক রামানুজাচার্য্য এই বিশ্ব পঞ্চকে কার্য্যাবস্থ ব্রহ্মের স্থূল দেহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

> নামরূপবিভাগবিভক্ত-স্থূলচিদচিদ্‌বস্তু শরীরং
> ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থং : ব্রহ্মণস্তথাবিধ স্থূলভাবশ্চ
> সৃষ্টিরিত্যভিধীয়তে।
>
> —সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে রামানুজদর্শন।

অর্থাৎ কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের নামরূপভেদে ভিন্ন স্থূলদশাপ্রাপ্ত চিৎ অচিৎ শরীর, ব্রহ্মের এইরূপ স্থূলভাবকে সৃষ্টি বলে।" আর, প্রাচীন শ্রুতি এই তত্ত্বই অন্যভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" সমস্ত ভূত সমূহ তাঁহার একপাদমাত্র, তাঁহার অন্য তিন পাদ অমৃত— বিশ্বাতীত। অর্থাৎ সেই পরম পুরুষ যুগপৎ এই প্রপঞ্চে পরিব্যাপ্ত (Immanent) আছেন এবং এই প্রপঞ্চাতীত (Transcendent)।

যিনি নির্গুণ অথচ সগুণ, নির্ব্বিশেষ অথচ সবিশেষরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন তাঁহার ঐ বিশ্বময়ী মূর্ত্তির ধারণা দ্বারা তাঁহার স্বরূপের সন্ধান করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক বা সাকার উপাসনা। প্রকৃত সাধকের সাকারোপাসনা ত কোন আকৃতিবিশিষ্ট সান্ত দেবতার উপাসনা নহে—তাহা সসীমতার সহায়ে সেই অসীম অনন্তের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রণালী। তাই তাঁহাকে 'শতধা করি' ক্ষুদ্র করি'দিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে গিয়া অনেক সময়ই আমরা ক্ষুদ্রত্বের চাপের মধ্যে পড়িয়া মরিয়া যাই, উদ্দেশ্য-

কে ভুলিয়া উপাধিটিকে তাহার স্থানে বসাইয়া দেই, ভিতরকার শস্যটিকে ছাড়িয়া অর্থশূন্য বাহ্যাচারের খোসাটাকে মাত্র আশ্রয় করিয়া থাকি। আজ অনেক স্থলেই ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। * কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপাসনা নিরাকার নহে অথচ শেষোক্ত প্রকারের সাকারোপাসনা ও নহে; পরন্তু যে প্রকার উপাসনাকে পূর্ব্বে প্রকৃত প্রতীক উপাসনা বলিয়া আসিয়াছি ইহা ঐ জাতীয়। "গীতাঞ্জলিতে" পাঠক ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবেন। গ্রন্থের ৭, ৮, ৯, ১৫, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৪২, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯ ও ১৪০ পৃষ্ঠার কবিতাগুলি আবার এ সম্পর্কে পাঠক পাঠ করিয়া আমার উক্তির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করুন। কেবল দুটি স্থল হইতে একটু নমুনা দিব—

"প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।"—৭পৃঃ।
আলো, তোমায় নমি, আমার
মিলাক্ অপরাধ।
ললাটেতে রাখ আমার
পিতার আশীর্ব্বাদ।
বাতাস তোমায় নমি, আমার
ঘুচুক অবসাদ,
সকল দেহে বুলায়ে দাও
পিতার আশীর্ব্বাদ।
মাটি তোমায় নমি, আমার
মিটুক সর্ব্বসাধ।

---

* প্রতীকোপাসনায় এইরূপ বিপদাশঙ্কার কথা স্বামীবিবেকানন্দ ও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁর "ভক্তিযোগ" (ইংরেজী) ৭০-৭৪পৃঃ দ্রষ্টব্য।

গৃহভরে ফলিয়ে তোলা
পিতার আশীর্ব্বাদ।—৫৮ পৃঃ।

পাঠক, দেখিলেন "গীতাঞ্জলিতে" যে সকল আধ্যাত্মিক রত্ন-রাজি নিহিত রহিয়াছে তাহাকেই Hindu Review এর পূর্ব্বোক্ত লেখক 'কল্পনা', 'অ-বস্তু' বলিয়াছেন,! ইহার মূল কারণ যে সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার তাহা লেখকের উদ্ধৃত বাক্যাংশ (lend themselves to the creation of realistic represtenations etc.) হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কারণ ৬ষ্ঠ প্রবন্ধে উল্লিখিত "বিজয়া" পত্রের লেখক যে ১৩২০ সনের "বিজয়া" ৮৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁর পৈতৃক ধর্ম্ম। * * সুতরাং ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্ম্মের অধিকার যতটুকু, রবীন্দ্র ন্নাথের অধিকার ও মোটের উপর তাহাই। কোনও কোনও ব্রাহ্ম মাঝে মাঝে এ অধিকার ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন জানি, কিন্তু রবীন্দ্র নাথ এ অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া এ পর্যান্ত কোনও প্রকারের প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায় নাই।" আর, "রবীন্দ্রনাথের সম্প্রদায়ের ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরাকার" ইত্যাদি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান সাধন প্রণালী যে নিরবচ্ছিন্ন নিরাকার নহে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। যাঁহারা দেখিয়া ও দেখিতে চাহেন না যুক্তি তাঁহা-দের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য।

পূর্ব্বোক্ত সমালোচক রবিবাবুর 'উর্ব্বশী', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি, যে সকল কবিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ব্যষ্টিভাবে বিচার করিলে তাহাদের প্রত্যেকটিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ, তাহাদের শ্রেষ্ঠতা কোন কাব্য-রস-রসিক ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু সমষ্টিভাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-সাহিত্য আলোচনা করিয়া তার মর্ম্মগত শিক্ষার সূত্রটি অনুসরণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ সকল শ্রেষ্ঠ কবিতাদিও কবি-বরের কাব্যগত মূলতত্ত্বের অভিব্যক্তির পথে একেকটি ক্রম (stage) মাত্র এবং "গীতাঞ্জলিতে"ই ঐ তত্ত্বের পূর্ণ পরিণতি—যে সীমাতীত একের অভিমুখে তাঁহার কাব্যের বিপুল বিচিত্র

ধারা এতদিন উদ্দামবেগে ছুটিয়াছিল, "গীতাঞ্জলিতে" তিনি যেন সত্য-শিব-সুন্দররূপে আসিয়া প্রেমের বন্ধনে কবিকে ধরা দিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে 'সুরমার' পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের একটি উক্তির উল্লেখ করিয়া এ আলোচনার উপসংহার করিব। তিনি রবি বাবুর কাব্যের অপকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—মধুসূদন হেম-নবীনের কবিখ্যাতির প্রতিষ্ঠা এ দেশেই হইয়াছিল, তবে রবীন্দ্রনাথকে কবি যশঃপ্রার্থী হইয়া সমুদ্রের পরপারে পাশ্চাত্যদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরটি অতি সংক্ষেপ ও সহজ। আমরা এখনও সেই দারুণ দুঃখ ও লজ্জা ভুলি নাই যে অমর কবি মধুসূদনকে পত্নী সহ দাতব্যচিকিৎসালয়ের পাষাণ-বক্ষে আশ্রয় নিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং "দশমহাবিদ্যার" কবিকে ও বৃদ্ধাবস্থায় দৃষ্টিহারা হইয়া উদরান্নের জন্য ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে নবীনচন্দ্র যৌবনারম্ভ হইতেই রাজানুগ্রহ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ধনীর ঘরে জন্মিয়াছিলেন। আর, সমালোচকের স্মরণ না থাকিলেও আমরা অবগত আছি যে "মেঘনাদবধের" কবির কবিযশোরশ্মি হরণ করিবার জন্য "ছুছুন্দরী বধ" নামক ব্যঙ্গ কাব্য (Parody) এ বঙ্গেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" নামক প্রবন্ধাবলীর সুতীক্ষ্ণ শররাশি "রৈবতক" 'কুরুক্ষেত্র" "প্রভাসের" কোমলাঙ্গের উপর অজস্র বর্ষিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর রসগ্রহিতার ও প্রতিভা পূজার ইহার অধিক প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি আছে!

সমালোচক বিদ্রূপচ্ছলে রবিবাবুকে একাধিক বার "কবি-রবি" এই উপাধি দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এই অলঙ্কার পরিহাস-বাক্য অচিরে সত্যভাবে গৃহীত হইয়া অমর হইয়া যাইবে;—আমি বিশ্বাস করি এই কবি-রবির প্রতিভা-রশ্মিই আকাশের সৌর রশ্মির ন্যায় দেশগত জাতিগত সকল ভেদের কৃত্রিম বিভাগ-রেখা মুছিয়া দিয়া সমগ্র

সভ্য জগৎকে আলোকিত করিয়া সেই একমেবাদ্বিতীয়মের সুবন্ধ সূত্রে গ্রথিত করিয়া মানবজাতিকে এক অপূর্ব্ব নবজীবনের স্পন্দনে কৃতার্থ করিবে। ওই চাহিয়া দেখ সেই সুপ্রভাতের উষারক্ত রাগরেখা উত্তর সাগরোপকূলে ফুটিয়া উঠিয়াছে! রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ইহাই প্রকৃত গূঢ়ার্থ। মঙ্গলবিধাতার শুভবিধানে জগতের মহাকল্যাণের এই প্রভাতবিহঙ্গ-কাকলী যখন আরও একটু স্ফুটতর হইয়া উঠিবে তখন অবিশ্বাসীর বিদ্রূপ-কণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়া বিপরীত সুর ধরিবে এবং তখন কবি Goldsmith এর* কথায় বলিতে পারা যাইবে—

Truth from his lips prevailed with double sway,
And those who came to scoff remained to pray

অর্থাৎ—

তত্ত্বকথা তাঁহার মুখের
জিত্‌লো সবে দ্বিগুণ বলে,—
যত ঠাট্টাকারী অবিশ্বাসী
মিশ্‌লো সবে ভক্তের দলে!

---

* কাহারও মনে অনাবশ্যক পীড়া দেওয়ার আশঙ্কায় এই উদ্ধৃত কবিতাংশের ২য় ছত্রের 'those' শব্দটি মূল কবিতার অন্য একটি তীব্রতর (stronger) শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।